এক ব্যাগ শংকর

শংকর

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

মৌসুমী
কাকলি
কৌশিক
মিঠাই
রাণা ও
গোপা-কে

লেখকের নিবেদন

এতোদিন কেবল বড়দের জন্যেই কলম পিষে এসেছি—ছোট-বড় সবার জন্যে একই সঙ্গে লেখার চেষ্টা করিনি। যাঁর খপ্পরে পড়ে আমার এই দুঃসাহস হলো তাঁর নাম শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বাংলা সাহিত্যের এই জাঁদরেল কবি এবং প্রখ্যাত পত্রিকা 'আনন্দমেলা' সম্পাদকের কাছে গোড়াতেই ঋণ স্বীকার করে রাখছি।

কোন পাতায় কী আছে

উপন্যাস

খারাপ
লোকের
খপ্পরে

দাদু ভবনাথ সেনের সঙ্গে এই সাত-সকালে পিকলুর ঠাকুমার ঝগড়া লেগেছে। কারণটা অবশ্যই পিকলু।

একটু আগেও ঠাকুমা একবার পিকলুর দাদুর কাছে গিয়েছিলেন। ভবনাথ তখন একমনে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বউকে দেখে সংসারের দরকারি কথা আলোচনা না-করে তিনি বললেন, "চাঞ্চল্যকর চুরি! রয়টার খবর দিচ্ছে ইনটারন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে সর্দি ভাইরাস চুরি হয়েছে।"

ভীষণ রেগে গেলেন পিকলুর ঠাকুমা। এমনভাবে ভবনাথ চুরির খবরটা তুলেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন বিদেশের কোনো রাজপ্রাসাদ থেকে মহামূল্যবান হীরে-জহরত কিছু উধাও হয়েছে।

মুখ বেঁকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে পিকলুর ঠাকুমা বললেন, "ছাপবার মতো আর খবর পেলো না কাগজওয়ালারা?"

ভবনাথ তখন গভীর আগ্রহের সঙ্গে পুরো খবরটা পড়ে চলেছেন, "শোনো, শোনো—ভীষণ ব্যাপার। আন্তর্জাতিক সর্দি ইনস্টিটিউটের ডিরেকটর আজ স্বীকার করেন যে এক পাত্র সর্দি ভাইরাসের হিসাব তাঁরা মেলাতে পারছেন না। তিনি দুঃখ করে বলেন, গবেষণা কেন্দ্রের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম সর্দির হিসেব মিলছে না।"

ঘেন্নায় পিকলুর ঠাকুমার বমি হবার উপক্রম। তিনি এই সব

নোংরা বিষয়ে আলোচনা পছন্দ করেন না। ভবনাথকে ওই খবরের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখে তিনি রেগেমেগে রান্নাঘরে চলে এলেন।

উনুনে আগুন তখন গনগন করছে। পিকলুর জলখাবার তৈরির জন্যে ঠাকুমা উনুনে কড়া চাপিয়ে দিলেন।

চিঁড়ে-ভাজা আর চা হাতে পিকলুর ঘরে ঢুকেই ঠাকুমা দেখতে পেলেন তাঁর আদরের নাতি মাদ্রাজ থেকে-পাঠানো পিকচার পোস্টকার্ডখানার দিকে একমনে তাকিয়ে আছে।

ছবিটা পাঠিয়েছে শতরূপা। একদিকে বঙ্গোপসাগরের রঙিন ফটো অন্যদিকে শতরূপার নিজের হাতের লেখা, "দাদা, আমরা আজ ভেলোর যাচ্ছি। ওখান থেকে তোকে আবার চিঠি লিখবো।"

ঠাকুমা জানেন, পিকলু এই চিঠিটা গতকালও সাত-আটবার পড়েছে। আজও সেই দৃশ্য দেখে পিকলুর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে তিনি বললেন, "লক্ষ্মী সোনা আমার, কিচ্ছু ভেবো না—সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শতরূপার শক্ত কী এক অসুখ হয়েছে—তাই পিকলুর বাবা-মা বোনকে নিয়ে ভেলোর গিয়েছেন। ঠাকুমা ভরসা দিলেন, "ওখানে মস্ত হাসপাতাল, বড়-বড় সব ডাক্তার—শতরূপা খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে আসবে।"

এর পরেই ঠাকুমা রেগে উঠলেন দাদুর ওপর। হাঁটার স্পিড ডবল করে দিয়ে রীতিমতো বিরক্তভাবে তিনি বৈঠকখানায় হাজির হলেন। দাদু ভবনাথ সেন তখন গড়গড়ায় লাল রবারের পাইপটা বাঁ-হাতে ধরে ডান হাতে একখানা চিঠির খাম খুলবার চেষ্টা করছেন। চিঠিখানা লিখেছে সাহিত্যিক ভবনাথের কোনো ভক্ত পাঠক : "আপনার লেখার তুলনা হয় না। আপনি আমাদের দেশের গৌরব।"

"তুমি কি অপদার্থই থেকে যাবে? সংসারের কোনো কাজে লাগবে না?" হুঙ্কার ছাড়লেন ঠাকুমা। সহজে রাগেন না ঠাকুমা, কিন্তু একবার মেজাজ গরম হলে তাঁর মাথার ঠিক থাকে না।

দাদু ততক্ষণ গড়গড়ায় আর-একবার টান দিয়ে চিঠির গোছা থেকে একখানা পোস্টকার্ড টেনে নিলেন। বেনারস থেকে একজন পাঠিকা লিখেছেন: "আপনার লেখা পড়তে-পড়তে বিশ্বসংসারের কথা ভুলে কোথায় যেন চলে যাই।"

চিঠিখানা ঠাকুমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ভবনাথ বললেন, "দেখো, কী সব লিখছে।"

"আমার তো বিশ্বসংসার ভুললে চলবে না," মুখ ঝামটা দিলেন ঠাকুমা। "আমার ঘর সংসার আছে—পিকলুর চিন্তা আছে।"

"পিকলু তো খুবই ভাল ছেলে—ওর সম্বন্ধে আমার তো কোনো চিন্তাই হয় না।" অত্যন্ত শান্তভাবে ভবনাথ আবার গড়গড়ার পাইপে মুখ লাগিয়ে গুড়ুক গুড়ুক শব্দ করতে লাগলেন।

ঠাকুমা কয়েক মুহূর্ত ভবনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু ওদিক থেকে আর কোনো সাড়া না পেয়ে গলার স্বর টপ ভল্যুমে তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন, "বলি, তুমি কি এই কলকাতা শহরে আছো? না বলিভিয়া বাহামায় চলে গিয়েছো?"

ঠাকুমার এইসব কথা নিজের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে পিকলু ফিক করে হেসে ফেললো। দাদুর শেষ কিশোর উপন্যাসটার পটভূমি বলিভিয়া। দুর্দান্ত হয়েছে নবেলখানা।

ওটা পড়া ছিল বলেই তো কুইজ কনটেসটে পিকলু ক্লাশের সবাইকে হারিয়ে দিলো। মাস্টারমশায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "বলিভিয়া কোথায়? ক্লাশের ছেলেরা কিছুই বলতে পারলো না। একজন

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লো, "বাইলাডিলার কাছে—মধ্যপ্রদেশে।" "নো নো—একেবারেই ভুল।" মাস্টারমশায় গম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন, "আর কেউ? এনি ওয়ান এলস?" পিকলু সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বলে দিলো, "দক্ষিণ আমেরিকায়।"

"বলিভিয়ার রাজধানী?" মাস্টারমশায় ভাবলেন এবার পিকলু হেরে যাবে।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সে উত্তর দিলো: "লা-পাজ।" এসব খবর দাদুর বই থেকেই পিকলু জেনে ফেলেছে।

পিকলু ভেবেছিল, দাদু দক্ষিণ আমেরিকার ওইসব জায়গায় নিজে গিয়েছেন—অনেকদিন থেকেছেন। না-হলে লা-পাজ শহরের অমন বর্ণনা করলেন কী করে?

কিন্তু কলকাতায় এসে ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করতে ব্যাপারটা তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। "বলিভিয়া! মাগো! সে আবার কোথায়? গতবার তো বই লেখার আগে হরিময় ঠাকুরপোর সঙ্গে বালিতে গিয়ে ক'দিন থাকলো।"

"বালী! বালীদ্বীপ। সেও তো অনেক দূর। ভারী সুন্দর জায়গা।" ওখানকার ক'খানা রঙিন ছবি পিকলু দেখেছে। ওখানকার মেয়েদের মাথায় কী চমৎকার ফুল গোঁজা থাকে।

ঠাকুমা বললেন, "দূর! বালিতে তো কোনো মেয়ে মাথায় ফুল গোঁজে না। আমার বাপের বাড়ি তো বালিতে—বালি-উত্তরপাড়ায়। এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে—তোকে একদিন নিয়ে যাবো'খন।"

বলিভিয়ার কথায় দাদু মুখ তুলে চাইলেন। পিকলুর ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বলছো?"

"বলছি বই কি। বলবার জন্যেই তো এসেছি। কিন্তু কোনো

কথাই তোমার কানে ঢুকছে না," ঠাকুমা বেশ জোরের সঙ্গেই ঝগড়া করতে গেলেন।

কিন্তু সাহিত্যিক দাদু ইতিমধ্যে অন্য কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছেন। তিনি চোখ বন্ধ করেছেন, মাঝে-মাঝে শুধু গড়গড়ার চাপা আওয়াজ হচ্ছে গুড়ুক-গুড়ুক।

এবার ঠাকুমার রাগ বাড়লো। বললেন, "ঠিক আছে। তুমি যখন কিছুই করবে না, তখন আমি লালবাজারেই খবর পাঠাচ্ছি।"

নাটকীয় এই মুহূর্তে এক ভদ্রলোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

বাইরের দরজাটা বন্ধ ছিল না। ভদ্রলোক বলতে যাচ্ছিলেন, "বাড়ির দরজা কখনও খুলে রাখবেন না। কখন কী বিপদ হয়—কে জানে। খারাপ লোকে দেশটা বোঝাই হয়ে যাচ্ছে।"

ঠিক এই সময় ঠাকুমার মুখে লালবাজার কথাটা শুনে ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন।

"অ্যাঁ! সাত-সকালে লালবাজার কেন? যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই...অ্যাঁ...বউদি..."

ভদ্রলোক যে এ-বাড়ির শুভানুধ্যায়ী এবং সকলকেই খুব ভালবাসেন তা বোঝা যাচ্ছে।

পিকলু দেখলো, জাম রংয়ের খাদি হাফ্-হাতা পাঞ্জাবি পরেছেন ভদ্রলোক। রোগা পাকানো চেহারা। বোধহয় দাদুর বয়সী হবেন ভদ্রলোক। মাথা জুড়ে মস্ত টাক—শুধু এক থেকে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় ঘন কালো চুল রয়েছে। ঠিক যেন টেকো মাথার তলায় একখানা মোটা কালো রিবন জড়ানো আছে।

দাদু হেসে ভদ্রলোককে ভরসা দিলেন, "চুরি ডাকাতির ব্যাপার নয়। উনি একবার বেয়াইমশায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান।"

এ-কথা শুনে ভদ্রলোক আরও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। "কী সর্বনাশ। কী করেছিলেন ভদ্রলোক? লালবাজার পুলিস লক্‌-আপ সে-অতি খারাপ জায়গা! ব্রিটিশ আমলে একবার ঐ হাজতে রাত কাটিয়ে এসেছিলাম।"

ভদ্রলোকের কথায় দাদু বেশ মজা পাচ্ছেন। গড়গড়ায় টান দেওয়া বন্ধ করে তিনি বললেন, "লক্‌-আপ নয়। খোকার শ্বশুরমশায় তো এখন ওখানেই ট্রান্সফারড হয়েছেন। লালবাজারের মধ্যে বড়-বড় কোয়ার্টারও আছে। আমার গিন্নী তো কয়েকদিন ওখান থেকে ঘুরে এসেছেন।"

দাদুর টেকো বন্ধুটি এবার টাকে হাত দিলেন। বললেন, "বউদি! আপনিই তাহলে হচ্ছেন সেই রাইট পার্সন যাকে আমি খুঁজছি।"

"কী করতে হবে বলুন?" ঠাকুমা ঝগড়া বন্ধ রেখে জিজ্ঞেস করলেন।

গলাটা একটু নামিয়ে টেকো ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "একটা কোশ্চেনের অ্যানসার জানবার আমার খুব ইচ্ছে। আপনার বেয়াইকে যদি একটু জিজ্ঞেস করেন। বিনা লাইসেন্সে কোন সাইজ পর্যন্ত রামপুরিয়া সঙ্গে রাখা যায়?"

"কী পুরিয়া?" ঠাকুমা ঠিক বুঝতে পারছেন না। "খোকার শ্বশুর তো ডি-সি, উনি ডাক্তার নন—পুরিয়া-টুরিয়া কোথায় পাবেন?"

টেকো ভদ্রলোক এবার ছোট ছেলের মতো হেসে ফেললেন। "এতো বড় রাইটারের বউ আপনি। থার্টি এইট ইয়ার্স বাংলা বইয়ের লাইনে আছেন—আর সামান্য ব্যাপারটা জানেন না। গতবারের সাপ্তাহিক শিহরণ পত্রিকায় দাদার যে-লেখাটা বেরিয়েছে সেখানেই রামপুরিয়ার রেফারেন্স রয়েছে। অপূর্ব লাইনখানা: 'রামপুরিয়া

রামও নয়, পুরিয়াও নয়—স্রেফ একধরনের ছুরি; স্প্রিং টিপলেই কেউটে সাপের মতো বেরিয়ে এসে ছোবল মারে। অথচ অন্য সময় দেখলে ছুরি বলে মনেই হয় না!"

গল্পটা পিকলুর পড়া হয়নি। কি মা পড়েছিল এবং পিকলু শুনেছে, এই রামপুরিয়ার কল্যাণেই নায়ক শশধরবাবু দুর্দান্ত দস্যু ভোজরাজের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

সেই থেকেই বোধহয় এই ভদ্রলোক ভাবছেন, পথেঘাটে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে সঙ্গে একখানা রামপুরিয়া রাখবেন।

"সঙ্গে রাখবার আর জিনিস পছন্দ করতে পারলে না!" দাদু বকুনি লাগালেন। ছোরাছুরি রিভলবার কিছু সঙ্গে রাখাই দাদু যে পছন্দ করেন না তা পিকলু জানে।

ভদ্রলোক এবার বললেন, "আপনি তো বলে খালাস। কিন্তু শ্রীভৃগু প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে লিখছেন, সাবধান, শত্রু কাছেই আছে। যে কোনো ক্ষতি হতে পারে।"

দাদু বলতে গেলেন, "ওই সব রাবিশগুলোয় তুমি বিশ্বাস করো!" কিন্তু ঠাকুমা ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না, রামপুরিয়ার মাপটা আমি আপনাকে জানিয়ে দেবো।"

ঠাকুমা এবার বাইরের লোকের সামনে দাদুর হাঁড়ি ভাঙলেন। "যা অবস্থা দেখছি, আমাকে এবং পিকলুকে এ-বাড়ি ছেড়ে লালবাজারেই উঠতে হবে। ওঁর তো কোনোদিকেই নজর নেই—দিন রাত শুধু প্লট প্লট আর প্লট। গল্পের প্লট খোঁজা ছাড়া আপনার দাদার আর কিছুই ভাল লাগে না।"

টেকো ভদ্রলোক এবার বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলেন। কোন পক্ষে সাপোর্ট দেবেন বুঝতে পারছেন না।

বাইরের লোকের সামনে অপমানিত দাছু একটু রেগে বললেন, "লেখকের যখন বউ হয়েছো তখন প্লট, চরিত্র, সংলাপ এসব সহ্য করতেই হবে।"

"লেখক জানলে বিয়েই করতাম না," ঠাকুমা সোজাসুজি উত্তর দিলেন। "বিয়ের আগে তুমি তো শুধু পদ্য লিখতে। ছোট-ছোট জিনিস, বেশি হুজ্জুত নেই। তারপর এই ছেলেদের লাইনে এসে তোমার কী যে দুর্মতি হলো। কখনও কিছু বলবার উপায় নেই— সব সময় প্লটের মধ্যে ডুবে আছো।"

টেকো-ভদ্রলোক এবার দাছুর পক্ষে যাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "দাদার যে আবার সব স্পেশাল প্লট। একটু বেশি খাটাখাটনি করতেই হয়—সাধে কি আর ওঁকে শিশুসাহিত্যসম্রাট টাইটেল দেওয়া হয়েছে।"

"রাখুন-রাখুন।" এই বলে ঠাকুমা এবার পিকলুর ঘরে চলে এলেন।

"বউদির মেজাজ আজ এতো চড়া কেন," এখনও ভদ্রলোক বুঝতে পারেননি।

ভবনাথ সেন গড়গড়ায় সামান্য টান দিয়ে বললেন, "তোমার বউদির দোষ নেই। প্রায় এক সপ্তাহ হলো পিকলু এসেছে, অথচ এখনও পর্যন্ত কলকাতা শহরের কিছুই ওকে দেখানো হলো না।"

"ভুলুর ছেলে! বম্বে থেকে এখানে এসেছে?" টেকো-ভদ্রলোক বেজায় খুশী হলেন। দাছুর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ রেখে তিড়িং করে ভদ্রলোক এবার ভিতরের ঘরে চলে এলেন।

ঠাকুমা আলাপ করিয়ে দিলেন পিকলুর সঙ্গে, "তোমার দাছুর বন্ধু —হরিময় চৌধুরী।"

হরিময়বাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, "তোমাদের সঙ্গে দূর সম্পর্কের একটা

আত্মীয়তা আছে। কিন্তু সেটা আমি বলি না এই জন্যে যে দুর্জনেরা বলবে সাহিত্যিক ভবনাথ সেন শুধু আত্মীয়তোষণ করছেন।"

ঠাকুমা বললেন, "বুঝতেই পারছেন, ভুলুর ছেলে—পিকলু।"

"খুউব বুঝতে পারছি—খুউব ছোটবেলায় যখন এসেছিলে তখন রিকশ চড়ে দু'জনে খুউব ঘুরেছি।"

তখন যে পিকলু খুব রিকশ চড়তো তা মনে নেই। ঠাকুমা বললেন, "রিকশ চড়লে তোর আর কিছুই ভাল লাগতো না। তোর কান্নাকাটি এই দাদুই সামলাতো।"

ঠাকুমা এবার অতিথির জন্যে চায়ের জল চাপাতে গেলেন। হরিময়বাবু বেজায় খুশী মেজাজে একখানা বেতের টুল টেনে নিয়ে পিকলুর পাশে বসে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ভাল নামখানা যেন কী?"

"পুণ্যশ্লোক সেন।"

পিকলুর উত্তর শুনেই হরিময়বাবু টাকে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। "হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে বটে—তোমার দাদু খুব পছন্দ করে নাম দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে কনসাল্টও করেছিলেন এবং সত্যি বলতে কী, আমি তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার দাদুর মাথায় যা ঢোকে তা করবেনই।"

এমন সুন্দর নাম, বম্বেতে কত মারাঠী ভদ্রলোক এই নামের প্রশংসা করেন। অথচ হরিময়বাবুর আপত্তি কেন? পিকলু বুঝতে পারে না।

হরিময়বাবু বললেন, "আমার আপত্তি টেকনিক্যাল কারণে। নাতিনাম্ ঠাকুর্দাকুমঃ। যার দাদু এতো বড় লেখক, সেও নিশ্চয় লেখক হবে!"

পিকলু চুপ করে আছে। হরিময়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। চার্লস ডিকেন্স এতো বড় নভেলিস্ট—তাঁর নাতনী মণিকা ডিকেন্স নাম করা লেখিকা হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়। তাঁর নাতি সত্যজিৎ রায়—এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ! এখন ভবনাথ সেনের নাতির এইটটি পার্সেণ্ট চান্স লেখক হবার। কিন্তু ওই 'পুণ্যশ্লোক' নামটা উচ্চারণ করতে কচি-কচি ছেলেমেয়েদের দাঁত নড়ে যাবে।"

হরিময়বাবুর কথা শুনে পিকলু হেসেই ফেললো। লেখক হবার কোনো ইচ্ছে নেই পিকলুর। সে হতে চায় বৈজ্ঞানিক : মহাকাশে যাবার বৈজ্ঞানিক। বোন শতরূপাকে সে বলে রেখেছে, ফ্রী পাশে সে একবার বোনকে সমস্ত মহাকাশ ঘুরিয়ে আনবে।

হরিময়বাবু বললেন, "আমাকে তুমি ঠিক চিনতে পারছো না, বোধহয়। আমি চমচম পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর।"

চমচম পত্রিকার নিয়মিত পাঠক পিকলু। প্রথম পাতায় হেডিং থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত সে পড়ে ফেলে, কিন্তু সেখানে হরিময়বাবুর নামটা সে একবারও দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না।

"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?" এবার নিজের টাক-মাথায় হাত দিলেন হরিময়বাবু। জিজ্ঞেস করলেন, "জিনিসটার নাম কী ?"

ফিক করে হেসে ফেললো পিকলু। "ওই জিনিসটার নাম কে না জানে ? টাক।"

হরিময়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "টাকের একটা সিরিয়াস সংস্কৃত নাম আছে।"

পিকলুর এবার মনে পড়েছে, চমচম পত্রিকায় সম্পাদকের নাম থাকে : ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরী। ইন্দ্রলুপ্ত মানে তাহলে টাক।

চাপা গলায় হরিময়বাবু জানতে চাইলেন, "ছদ্মনামখানা কী রকম হয়েছে? তোমার দাদু তো প্রথমে শুনেই আমাকে কংগ্রাচুলেট করেছিলেন। সন্তুষ্ট হয়নি শুধু আমার ভাইপো। ইলু চৌধুরী অথবা ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরী নামে কোনো চিঠি দেখলেই সে চটে উঠতো।"

হরিময় এবার মনের খুশীতে পিকলুর সঙ্গে চমচম পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। হরিময়বাবুর ওই স্বভাব—ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই তাদের সঙ্গে একদম মিশে যান, তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় চমচম পত্রিকা সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ করেন।

হরিময়বাবু বললেন, "চমচম নামখানা তোমার মিষ্টি লাগে না?"

"মিষ্টি বলে মিষ্টি!" পিকলু উত্তর দিলো।

"অথচ আমার চাকর এবং সহ-সম্পাদক বিজয়ের ধারণা নামটা মোটেই ভাল নয়।" দুঃখ করলেন হরিময়বাবু। বললেন, "কাগজের নাম দিতে গিয়ে খু-উ-ব কষ্ট পেয়েছি। যে নাম পছন্দ হয়, দেখি সে নামেই একখানা পত্রিকা রয়েছে। না-হলে আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স ছিল সন্দেশ। খেতে এবং পড়তে দুই মজা। কিন্তু ও-নামে কাগজ রয়ে গিয়েছে। তখন দেখলাম, নেকসট টু সন্দেশ ইজ চমচম। কোনো পত্রিকার নাম তো বোঁদে বা মিহিদানা রাখা যায় না। আমার বন্ধুর ইচ্ছে ছিল জিলিপি নাম হোক। আমার জন্ম বেনারসে। রাবড়ি এবং জিলিপির ওপর আমার একটু টান থাকবেই। কিন্তু জিলিপির প্যাঁচের মধ্যে আমি ছেলেদের ঢোকাবো না। তাছাড়া, জিলিপি গরম না-থাকলে খাওয়া যায় না। চমচম গরম খেতেও ভাল, বাসী খেতেও গ্রেট! চমচমের পুরানো সংখ্যাগুলো যে-কেউ পড়ে দেখুক, মনে হবে আধঘণ্টা আগে প্রকাশিত হয়েছে।"

হরিময়বাবু যে খাওয়া-দাওয়া ভালবাসেন তা তাঁর কথাবার্তায়

বোঝা যাচ্ছে। পিকলুকে তিনি বললেন, "তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খু-উ-ব ভাল হলো। আমার দু-একটা পরিকল্পনা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে নিই।"

চায়ের কাপ হাতে ঠাকুমা ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে পড়েছেন। তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "এইটুকু ছেলের সঙ্গে আপনার আবার কী গোপন পরামর্শ?"

হরিময়বাবু চোখ গোলগোল করে উত্তর দিলেন, "আমাদের চমচম পত্রিকার নীতিই হলো ছোটদের পরামর্শ অনুযায়ী চলা। দেখেন না, প্রতি সংখ্যায় প্রথম পাতায় মোটা অক্ষরে লেখা থাকে—বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।"

ঠাকুমা আবার মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, "আপনার আর বয়স বাড়লো না—ছোটদের কাগজ সম্পাদনা করতে গিয়ে আপনি নিজেও ছোট হয়ে রইলেন।"

হরিময়বাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পিকলুকে সাবধান করে দিলেন, "যা-কিছু তোমার সঙ্গে আলাপ হবে সমস্ত কিন্তু টপ সিক্রেট।"

পিকলুর উত্তরের অপেক্ষায় না-থেকেই হরিময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "টপ-সিক্রেট কথাটার মানে জানো তো? যাকে বলে কিনা, ভী-ষ-ণ গোপনীয়; কাউকে বলা চলবে না। মিলিটারিতে, পুলিসে, গভরমেণ্টে কালো-কালো বাক্সে এইসব টপ-সিক্রেট কাগজপত্তর থাকে—এমন সব খবর যা কেবল চোখের জন্যে, মুখের জন্যে নয়। সেইসব খবর দেখলে চোখ চমচম হয়ে যাবার অবস্থা।"

পিকলু সামনের বছর এন-সি-সিতে ঢুকবে। মিলিটারিতে ওর ভয় নেই। সে বললো, "বলুন আপনি, কেউ জানতে পারবে না।"

হরিময়বাবু বললেন, "আমার সহ-সম্পাদক বিজয় পর্যন্ত ব্যাপারটা

জানে না। ওকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না—মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, আমাদের সমস্ত গোপন খবর মাসিক শিশুবন্ধু পত্রিকায় পাচার হয়ে যাচ্ছে।"

এরপর পিকলু এবং হরিময়বাবুর গোপন আলোচনা আরম্ভ হলো। পাঠকদের মন জয় করবার জন্যে চমচম সম্পাদকের মাথায় নতুন এক পরিকল্পনা এসেছে। খাবার জিনিসই মানুষকে সবচেয়ে টানে—এ বিষয়ে হরিময়বাবুর মনে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বার করবেন কাটলেট সংখ্যা।

"তোমার কী মনে হয়? ঘোষণা করা মাত্রই হৈ-চৈ পড়ে যাবে না?"

পিকলু ঠিক বুঝতে পারছে না। "চমচম পত্রিকার কাটলেট সংখ্যা!" সে একটু সন্দেহ প্রকাশ করলো।

কিন্তু হরিময়বাবু গম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন, "আপত্তিটা কী? মিষ্টির সঙ্গে কেউ নোনতা খায় না?"

ঠাকুমা এই সময় আবার ঘরে ঢুকলেন। হরিময়বাবু আবার টাকে হাত দিলেন! ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, "নাতিটিকে কেমন দেখলেন?"

"টপ ক্লাস বলতে যা বোঝায়," সঙ্গে-সঙ্গে মতামত দিলেন হরিময়বাবু। "ঠিক যেন একখানা গরম কবিরাজী চিকেন কাটলেট। মচমচে অথচ মিষ্টি।"

ঠাকুমাও আদরের নাতির প্রশংসা করলেন। "খাসা ছেলেই বটে। বম্বেতে আবার কুইজ মাস্টার হয়েছে। সাধারণ জ্ঞানে কেউ ওর সঙ্গে পেরে ওঠে না।"

এই খবর পেয়ে হরিময়বাবু আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। "অ্যাঁ! বলবেন তো। এতোবড় খবরটা আমার কাছে চেপে গিয়েছেন। আমার

ভীষণ উপকার হলো। দুখানা কোশ্চেন আমার পকেটে রয়েছে, পাঠকরা পাঠিয়েছে। এ সংখ্যাতেই উত্তর দেবো ভেবেছিলাম। কিন্তু নকুলবাবুকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"নকুল কে?" ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন।

"চলমান বিশ্বকোষ—উনিই তো আমাদের প্রশ্নোত্তর বিভাগের শক্ত-শক্ত কোশ্চেনের উত্তরগুলো দেন। কিন্তু ওঁকে ক'দিন থেকে পাচ্ছি না—কোথায় যে উধাও হলেন।"

কোশ্চেন দুটো শোনবার জন্যে পিকলুর আগ্রহ হচ্ছে। হরিময়বাবু এবার পকেট থেকে কাগজখানা এবং সেই সঙ্গে পড়বার চশমা বার করে ফেললেন। চশমাটা নাকে লাগাতে-লাগাতে বললেন, "আজকালকার ছেলেমেয়েদের যা জেনারেল নলেজ। এমন সব কোশ্চেন পাঠায় যে সম্পাদকের মাথা ভোঁ-ভোঁ করে। উত্তর ভাবতে-ভাবতে ঘেমে উঠি—এ-মাথায় চুল গজাবে কী করে? ইঞ্জিন সব সময় গরম হয়ে আছে।"

এবার কোশ্চেনখানা ছাড়লেন হরিময়বাবু। "কোন দেশের রাজা দাড়ির ওপর ট্যাক্সো বসিয়েছিলেন? বাব্বা! কী প্রশ্ন! মাথা ঘুরিয়ে দেয়। ইনকাম-ট্যাক্স, সেল-ট্যাক্সের বড়-বড় অফিসারদের জিজ্ঞেস করলাম, গোঁফের ওপর ওঁর কখনও ট্যাক্সো বসিয়েছেন কিনা। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলেন না।"

পিকলু বলে উঠলো, "খুবই সোজা প্রশ্ন। রাশিয়ার রাজা পিটার দ্য গ্রেট।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন হরিময়বাবু। এবার তিনি সেকেণ্ড প্রশ্নখানা ছাড়লেন। "কোন দেশের রানী নকল দাড়ি পরতেন?"

এবারেও মেরে বেরিয়ে গেলো পিকলু। বললে, "আমাদের ক্লাশের সব ছেলে জানে, মিশরের রানীরা নকল দাড়ি পরতে ভালবাসতেন!"

হাতের গোড়ায় একটা হাতপাখা ছিল—সেটা তুলে নিয়ে নিজেকে ঘন-ঘন হাওয়া করতে লাগলেন হরিময়বাবু। চিৎকার করে বললেন, "বউদি, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছে। আপনার এই নাতির জ্ঞানের বহর দেখে।"

নাতির প্রশংসা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে ঠাকুমা বললেন, "ওইটুকু ছেলে যে কত খবর রাখে! আমি তো অবাক হয়ে যাই।"

ঠাকুমা এবার খবর দিলেন, "এই দেখুন না, এতোদিন পরে কলকাতায় এলো, এখনও পর্যন্ত কলকাতার কিছু দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারলাম না। কিন্তু পিকলু আমাকে গড়-গড় করে শুনিয়ে দিলো মনুমেন্টের উচ্চতা কত। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বাড়িটা নাকি কয়েক ইঞ্চি করে মাটিতে বসে গিয়েছে।"

"ভারী মজার খবর তো!" খুশীতে ঝলমল করে উঠলেন হরিময়বাবু। "মাটিতে বসতে-বসতে শেষ পর্যন্ত কোন দিন তাহলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উধাও হয়ে যাবে! শ্বেত পাথরের টেকো চূড়োয় ঘাস গজাবে।"

ঠাকুমার বোধহয় দাদুর সঙ্গে ঝগড়া করার কথাটা আবার মনে পড়ে গেলো।

সদর ঘরে দাদু একমনে গড়গড়ায় টান দিচ্ছেন—আর মাঝে-মাঝে ধোঁয়া খাওয়া বন্ধ রেখে চুপচাপ বসে থাকছেন।

দাদুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ঠাকুমা চড়া গলায় বললেন, "বলি শুনছো?"

দাদু যেন অন্য কোনো রাজত্বে চলে গিয়েছিলেন। আস্তে-আস্তে উত্তর দিলেন, "কিছু বলছো?"

ঠাকুমা : "বলি কী করছো?"

দাদু বললেন, "ভাবছি। কিন্তু ভেবে-ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না।"

এ-ঘরে বসে হরিময়বাবু ফিসফিস করে পিকলুকে বললেন, "তোমার দাদু গল্পের প্লট ভাবছেন—চমচমের কাটলেট সংখ্যার জন্যে স্পেশাল উপন্যাস।"

হরিময়বাবু এবার ঠাকুমাকে পাকড়াও করে পিকলুর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। হাতজোড় করে আবেদন করলেন, "বউদি, এই সময় দাদাকে একদম ডিসটার্ব করবেন না। ভবনাথ সেনের মুড নষ্ট হলে দেশের ক্ষতি হবে।"

ঠাকুমা রেগেমেগে উত্তর দিলেন, "একশোবার ডিসটার্ব করবো। পাঁচটা নয়, দশটা নয়—একটি নাতি, এতোদিন পরে এখানে এলো; মনমরা হয়ে বাড়িতে বসে আছে। তাকে নিয়ে একবারও বেড়ানো হলো না—কীরকম দাদু!"

হরিময়বাবু কিন্তু ভবনাথের অবস্থা আন্দাজ করতে পারছেন। ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ভবনাথ বললেন, "হরিময়, তুমি এসেছো। তোমাকে দেখলেই ভয় করে—মনে হয় পালিয়ে যাই।"

"ভয়ের কী আছে? আমি তো তাগাদা দিতে আসিনি।" হরিময়বাবু সান্ত্বনা দেন ভবনাথকে।

ভবনাথ বললেন, "কী যে হলো—গল্পটা শুধুই আটকে যাচ্ছে।"

"আটকাতে-আটকাতেই হঠাৎ খুলে যাবে। গতবারেও তো গোড়ার দিকে গপ্পোটা আটকাচ্ছিল। তারপর যখন বেরুলো তখন পাঠকমহলে হৈ-চৈ পড়ে গেলো।"

ভবনাথ বললেন, "সব ভাল যার শেষ ভাল। আমি তো গল্পের শেষ না-ভেবে প্রথম লাইন লিখি না। খোদ শরৎ চাটুজ্যে মশাই

আমাকে গোপনে পরামর্শটা দিয়েছিলেন—লাস্ট লাইনটা মনে না আসা পর্যন্ত কখনও ফার্স্ট লাইন লিখবে না।"

হরিময়বাবু বললেন, "আপনি সাধনা চালিয়ে যান। কোনোরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন না।"

এরপর হরিময়বাবু পিকলুর ঘরে ফিরে এসেছেন। তেমন দরকার হলে তিনি নিজেই পিকলুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবেন। অবশ্য পিকলুর যদি আপত্তি না থাকে।

পিকলুর ঠাকুমার কাছে প্রস্তাবটা দেবার কথা হরিময়বাবু ভাবছেন, ঠিক সেই সময় তিরিক্ষি মেজাজে দরজার ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠলো।

উঃ! কান ফুটো হয়ে যাবে! লোকটা হয় পালোয়ান না-হয় জীবনে কখনও বেল বাজায়নি। বাড়িতে একটা লেখক গভীর চিন্তা করছেন, সেই সময় কি এইভাবে কেউ বেল বাজায়? ভবনাথের উচিত এই সময়টা অন্তত সাহিত্যিক নগেন পালের মতো বাইরে লিখে দেওয়া: "দয়া করে জ্বালাতন করবেন না। প্লিজ্ ডোণ্ট ডিসটার্ব।"

নিজেই দরজা খুলতে গিয়ে হরিময়বাবু একটু ঘাবড়ে গেলেন। সাড়ে-ছ' ফুট লম্বা একখানা চলমান পাহাড় হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়লো। লোকটার মাথার চুলগুলো ছোট-ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু প্রমাণ সাইজের ইমপিরিয়াল গোঁফ। এই গোঁফটাই যে ইমপিরিয়াল তা অন্য সময় হলে হরিময়বাবু বলতে পারতেন না। কিন্তু পিকলুর দাদু গতবারের উপন্যাসখানায় নানারকম গোঁফের বিস্তারিত খবরাখবর দিয়েছেন। দু-দুবার প্রুফ সংশোধন করে হরিময়বাবুর ওসব মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এই ইমপিরিয়াল গোঁফ ও দাড়ি প্রথম রেখেছিলেন ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন।

ইমপিরিয়াল গোঁফের মালিককে পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক নিমেষে দেখে নিলেন হরিময়বাবু। পাঞ্জাব এবং ধুতির সঙ্গে লোকটা কালোরংয়ের ভারী বুট জুতো পরেছে।

ঘরে ঢুকেই সে দাহুকে সেলাম ঠুকলো এবং জানালো, তার নাম হুকুম সিং—লালবাজার থেকে এসেছে।

লালবাজার শুনেই হরিময়বাবু কিছুক্ষণের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। ঠাকুমা বললেন, "কিছু চিন্তা করবার নেই—হুকুম সিং অতি অমায়িক লোক ; পিকলুর পুলিস-দাহুর কাছেই ওর ডিউটি।"

হরিময়বাবুর অবস্থা দেখে হুকুম সিংও একটু মজা পেলো। বললো, "হামি তো পিলেন-ডিরিসে আছি, এখোন কোনো চিন্তা নেই।"

অ্যালসেশিয়ান কুকুর এবং পুলিস যে-ড্রেসেই থাকুক হরিময়বাবু বেশ অস্বস্তি বোধ করেন। অত বড় সাহিত্যিক নগেন পাল, তাঁর কাছে লেখা নেওয়াই বন্ধ করে দিলেন হরিময়বাবু, স্রেফ ওই কুকুরের ভয়ে। বাড়িতে বাছুরের সাইজের কুকুর থাকলে কে সেখানে লেখা আনতে যাবে? এক-একটা কুকুর যা অসভ্য হয়! মালিক ছাড়া কাউকে মানুষই মনে করে না।

হুকুম সিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠাকুমা একগাল হেসে ফেললেন। পিকলুর পুলিস-দাহু ওকে পাঠিয়েছেন, পিকলুকে বেড়িয়ে আনবার জন্যে।

"খোদ পুলিসের সঙ্গে হাওয়া খাওয়া!" হরিময়বাবু প্রস্তাবটায় বেশ উৎসাহিত বোধ করছেন।

ভবনাথ অনুরোধ করলেন, "হরিময়, তুমিও ওদের সঙ্গে একটু ঘুরে এসো না। যেখানে খুশী যতক্ষণ বেড়াতে পারবে। পুলিস সঙ্গে

থাকলে আমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না।"

হরিময়বাবু ঠিক মনঃস্থির করতে পারছেন না। ভবনাথবাবু বললেন, "আমার নাতিটি খুব ইনটেলিজেন্ট। রাস্তায় বেরুলেই নানা প্রশ্ন করে। তুমি থাকলে উত্তর দিতে পারবে।"

ভ্রমণের ব্যাপারে হরিময়বাবু কখনও পিছপা হন না—সে দূরদেশ ভ্রমণই হোক আর কলকাতা ভ্রমণই হোক। এবার আবার স্পেশাল সুবিধে—সঙ্গে পুলিস রয়েছে।

হুকুম সিংয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে বেজায় খুশী হরিময়বাবু। তাঁর আনন্দ যেন পিকলুর থেকেও বেশি।

পকেট থেকে চিকলেট বের করে হরিময়বাবু একটা পিকলুকে দিলেন, আর একটা নিজের মুখে পুরলেন। তারপর ফিসফিস করে পিকলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুকুম সিংকে একখানা চিকলেট দেবো নাকি? পুলিসে চিকলেট খায় তো?"

হুকুম সিংকে জিজ্ঞেস করতেই সে গোঁফ নাড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়লো। "রাম! রাম! আমি কোভি চিকেন খাই না!"

হরিময়বাবু এবং পিকলু দুজনেই হাসিতে গড়িয়ে পড়লো। হরিময়বাবু নিজস্ব স্টাইলে ব্যাখ্যা করলেন, "ওরে বাবা, চিকেন নয়—চিকলেট। বহুত আচ্ছা চুইং গাম—মুখকে অন্দর রাখকে পানকো মাফিক চিবোনেসে বহুত মজা আতা।"

কিন্তু হুকুম সিং কোনো অজানা অখাদ্য মুখে পুরে জাত নষ্ট করবে না।

হরিময়বাবু বললেন, "এ-জানলে আমি খদ্দরের টুপিখানা সঙ্গে আনতাম।"

পিকলু ভাবলো, হরিময়বাবু টাক ঢাকবার জন্যে ব্যস্ত। কিন্তু হরিময়বাবু বললেন, "মোটেই না। টাক থাকলে লোকে খাতির

করে। মুদির দোকানে ধার দেয়—ভাবে নিশ্চয় অনেক টাকা আছে।"

"তাহলে ?" পিকলু জিজ্ঞেস করে।

আসলে ভি-আই-পি ভি-আই-পি মনে হচ্ছে হরিময়বাবুর। "ভি-আই-পি বোঝো তো ?"

"খুব বড়-বড় লোক," পিকলু সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দেয়।

হুকুম সিং যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে চাপা গলায় হরিময়বাবু বললেন, "দু'রকম লোকের সঙ্গে পুলিস থাকে। হয় চোর ডাকাত, না-হয় ভি-আই-পি !"

পিকলু এবার হুকুম সিংকে জিজ্ঞেস করলো, "পণ্ডিতজী, কলকাতার সব চেনেন আপনি ?"

ইমপিরিয়াল গোঁফ নামিয়ে হুকুম সিং উত্তর দিলো, "জরুর ! কী চিনি না আমি ! কলকাতার সব-চোর-জোচ্চোর-পকেটমারকে আমি চিনি ; তারাও আমাকে চেনে।"

মস্ত বড় ভরসার কথা এটা হরিময়বাবুর পক্ষে। গতকালই ওঁর মানিব্যাগ পকেটমার হয়েছে নেবুতলার মোড়ে। আঃ ! হুকুম সিং সঙ্গে থাকলে কী মজাটাই হতো—মানিব্যাগটা পকেটেই থাকতো, মাঝখান থেকে পকেটমারও ধরা পড়তো।

হরিময়বাবুর পকেট মারার খবরে পিকলুর দুঃখ হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু কে যেন ওকে কাতুকুতু দিয়ে হাসিয়ে দিলো। পিকলু ভেবেছিল, হরিময়বাবু এই হাসি দেখে খুব দুঃখ পাবেন। কিন্তু তিনিও হাসতে লাগলেন। বললেন, "পকেটমারটার জন্যে আমার দুঃখও হয়। মানিব্যাগ গিয়েছে, কিন্তু মানি যায়নি। টাকাকড়ি আমি রাখি চমচম পত্রিকার একখানা পুরানো খামের মধ্যে। মানিব্যাগটা ফলস্ ! বাসে-ট্রামে যাচ্ছি অথচ সঙ্গে মানিব্যাগ নেই, দেখলে লোকের কাছে

প্রেস্টিজ থাকে না। প্রেস্টিজ বোঝো তো?" হরিময়বাবু কোশ্চেন করলেন।

"প্রেসার কুকার—খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায়," ঝটপট উত্তর দিলো পিকলু আর সেই শুনে হরিময়বাবু আবার ইন্দ্রলুপ্তে হাত দিলেন।

"মিস্টার পিকলু, প্রেস্টিজ দু'প্রকারের। মেয়েদের যে প্রেস্টিজ তার নাম প্রেসার কুকার, আর ছেলেদের প্রেস্টিজের নাম ইজ্জত।"

পিকলু ও হরিময়বাবু দুজন একসঙ্গে খুব হেসে নিলো। আর হুকুম সিং ভাবলো নিশ্চয় কোনো সিরিয়াস গোলমাল হয়েছে তাই ডি-সি সাহেবের বোম্বাই নাতি কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে হাসছে।

একজন ঝাঁকামুটে ফুটপাথের এক কোণে পা-ছড়িয়ে আরাম করছিল। হুকুম সিং তাকে গিয়ে ক্যাঁক করে ধরলো। সে-বেচারা তো অবাক। নিজের খুশিমতো সে একটু ঘুমোচ্ছে, দোষটা কী হলো? হুকুম সিং ভারী গলায় তাকে যা বললো, তার অর্থ: 'রাস্তাটা হাঁটবার জায়গা, ঘুমোবার নয়। বেশি তর্ক করলেই থানা, সেখান থেকে আদালত এবং আদালত থেকে জেল।'

হরিময়বাবু চমকে উঠলেন। "কখনও খেয়াল হয়নি আমার। ফুটপাথ কেবল ফুটের জন্য! শোবার পারমিশন থাকলে তো নাম হতো ফুট অ্যাণ্ড হেড পাথ!"

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, "কলকাতার সব কিছু চেনেন?"

হুকুম বললো, "জ-রু-র!" তারপর গড়গড় করে মুখস্থ বলতে লাগলো: আলিপুর, আমহার্স্ট স্ট্রীট, বালিগঞ্জ, বেলিয়াঘাটা, বেনিয়াপুকুর, ভবানীপুর, বিরজুতলা থেকে শুরু করে ট্যাংরা, টালিগঞ্জ, তিলজলা, উল্টোডাঙ্গা এবং ওয়াটগঞ্জ পর্যন্ত।

নামগুলো পিকলুর বেশ ভাল লাগছে। হুকুমচাচা তাহলে সত্যিই অনেক কিছু জানেন। এর মধ্যে কোথায় গেলে মজা বেশি হয়? পিকলু জানতে চাইছে হরিময়বাবুর কাছ থেকে।

আর-একখানা চিকলেট মুখে পুরে দিয়ে হরিময়বাবু পিকলুর কথায় আঁতকে উঠলেন। "ওসব জায়গায় তো কেউ ইচ্ছে করে যায় না। ধরে নিয়ে গেলে যায়। হুকুম সিং তো কলকাতার সাতচল্লিশটা থানা আর ফাঁড়ির নাম মুখস্থ বলে গেলো।"

হুকুম সিং একগাল হেসে বললে, "যে-থানায় ইচ্ছে চলিয়ে।" সর্বত্র চা-পানি পিলাবার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে হুকুম সিং।

কিন্তু হরিময়বাবু বেশ ঘাবড়ে গেলেন। পিকলুকে বললেন, "ওসব জায়গায় আমি কিছুতেই যাচ্ছি না। কে বেল দেবে?"

পিকলুও থানায় যাবার পক্ষপাতী নয়। কিন্তু এই বেলের কথায় একটু আগ্রহ হলো ওর। ওখানে গেলে বোধহয় শিবমন্দিরের মতো বেল পূজো দিতে হয়। "এমনি বেল? না কদবেল?" জিজ্ঞেস করে পিকলু।

আরও নার্ভাস হয়ে পড়লেন হরিময়বাবু। "অর্ডিনারি বেল ফল না। স্পেশাল বেল।"

পিকলু বললো, "ও, বুঝেছি। বেল মানে ঘণ্টা। আমরা বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা সম্পর্কে পড়েছি: হু উইল বেল দ্য ক্যাট্? বেড়াল কি থানায় গিয়েছিল?"

হরিময়বাবু বললেন, "আরও খারাপ কেস। একবার ঢুকলে বেরিয়ে আসা খুবই মুশকিল।"

পিকলু ভাবলো, থানায় গেলে পুলিসও খুব খাতির করে, ছাড়তে চায় না। যেমন বন্ধুরা বাড়িতে এলে বাবা বলেন, আরে বোসো,

বোসো। এখন যাওয়া হবে না।

হরিময়বাবু শুনিয়ে দিলেন, "যতক্ষণ না কোনো লোক এসে বেল দিচ্ছে ততক্ষণ ছাড় নেই। অথচ আমার মুশকিল হলো, যাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা তাদের কারুর নিজস্ব বাটি নেই। থালা গেলাশ কিছুই চলবে না—স্রেফ বাটি চাই।"

"বাটির সঙ্গে বেলের কী সম্পর্ক?" পিকলু এবার একটু রেগে যায়। তার সন্দেহ হচ্ছে হরিময়বাবু তাকে ছোট পেয়ে ঠকাচ্ছেন।

কিন্তু হরিময়বাবু বললেন, "বিশ্বাস করো, যাঁর নিজস্ব বাটি নেই, তিনি বেল দিতে পারেন না। বিষয়-সম্পত্তি-বাড়িওয়ালা লোক ছাড়া কাউকে এখানে বিশ্বাস করা হয় না! বেল মানে জামিন এবং সেই জামিন নিয়ে আসতে হয় আদালত থেকে।"

থানায় বেড়াবার প্রস্তাব সঙ্গে-সঙ্গে বাতিল হয়ে গেলো।

বেশ কিছুক্ষণ এমনি-এমনি ঘুরে বেড়াবার পরে রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে পিকলু বললো, যা বোম্বাইতে নেই এমন কিছু একটা জিনিস সে এখানে দেখতে চায়

হুকুম সিং এবং হরিময়বাবু দুজনেই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। যা কলকাতায় পাওয়া যায় না সেই সব দেখতেই তো ছেলেরা লুকিয়ে বম্বে পালায়। যা-কিছু বড়, ভাল এবং মিষ্টি তার নামই তো বোম্বাই —যেমন বোম্বাই আম, বোম্বাই চাদর, বোম্বাই-মিঠাই। কলকাতা-জাম, কলকাতা-কাঁঠাল বলে তো কিছুই নেই।

হুকুম সিংয়ের মাথায় কিছু মতলব আসছে না—সে হরিময়বাবুর মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে।

হরিময়বাবু গভীরভাবে চিন্তা করছেন। কিন্তু যা-কিছু স্পেশাল

সবই তো বোম্বাই। একখানা পাহাড় বা সমুদ্রও নেই কলকাতা শহরে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যে হরিময়বাবু চোখ বুজলেন। পিকলুর ভয় হলো, এই ভিড়ের মধ্যে রাস্তায় হরিময়বাবু না গাড়ি চাপা পড়ে যান।

হরিময়বাবুর কিন্তু ওসব দুশ্চিন্তা নেই। বললেন, "কায়দাটা তোমার দাদুর কাছে শিখেছি। যখনই আইডিয়া শর্ট পড়ে যায় সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বুজে ব্রেনটাকে ডার্ক রুম করে নিই। তারপর ফটাফট মতলব ভেসে ওঠে।"

হরিময়বাবু হঠাৎ চোখ খুললেন। বললেন, "হয়েছে। তাই বলি, এতো বড় কলকাতা শহর—বম্বেতে নেই এমন কোনো এস্পেশাল জিনিস না-থেকে যায়!"

হুকুম সিং বললো, "বাতাইয়ে—এখোনই ছোটাসাবকে দেখায়ে দিচ্ছি।"

হরিময়বাবু সগর্বে ঘোষণা করলেন, "ট্রাম! বম্বেতে এ-জিনিস নেই।"

একটা চলন্ত ট্রামে হাত দেখিয়ে ওরা তিনজন উঠে পড়লো। উত্তেজনার মাথায় ওরা পিছনের গাড়িটাতে চড়েছে। পিকলুর খুব মজা লাগছে। কীরকম ঢক-ঢক করতে-করতে গাড়িখানা একটু এগোচ্ছে, আবার থামছে।

ট্রামগাড়িতে হরিময়বাবু বেশি চড়েন না। ওঁর ধারণা, পকেটমারেরা ট্রামকেই একটু বেশি নেকনজরে দেখে। হরিময়বাবুর পছন্দ রিকশ।

এই পছন্দর কথা শুনে পিকলু হেসে ফেললো। হরিময়বাবু বললেন, "হাসছো কি? বেস্ট গাড়ি হলো এই রিকশ। তোমার দাদু পর্যন্ত একটা বইতে লিখেছেন—এমন দিন আসছে যখন পৃথিবীতে

রিকশ ছাড়া আর কোনো গাড়িই থাকবে না।"

পাছে ট্রামের অন্য লোকেরা শুনতে পায় বলে পিকলুর কানের খুব কাছে মুখ এনে হরিময়বাবু বললেন, "রিকশতে পেট্রোল লাগে না, ইলেকট্রিক লাগে না, গোরু লাগে না। রিকশ বিষাক্ত ধোঁয়া ছাড়ে না, মুখোমুখি কলিশনের ভয় নেই—বৃষ্টির জলে গাড়ি আটকায় না—ট্রাফিক জ্যাম পর্যন্ত রিকশকে জব্দ করতে পারে না।"

ট্রামে প্রচণ্ড ঠাসাঠাসি। অজস্র লোক উঠেছে। ভিড়ের চোটে দরজা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। কণ্ডাক্টরকে আসতে দেখে হরিময়বাবু টিকিট কাটবার জন্যে পকেটে হাত দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হুকুম সিংয়ের সঙ্গে কণ্ডাক্টরের দৃষ্টি বিনিময় হলো। ইঙ্গিতে হুকুম সিং প্রথমে পাঞ্জাবির বুকপকেটটা এবং পরে হরিময়বাবু ও পিকলুকে দেখিয়ে দিলো। কণ্ডাক্টর এরপর কাছেই এলো না।

হরিময়বাবু বললেন, "আঃ। এরপর থেকে সম্ভব হলে রোজ আমি হুকুম সিংয়ের সঙ্গে বের হবো। কোথাও ওদের টিকিট লাগে না।"

একজন গ্রাম্য বুড়ি লেডিজ সীটে বসে ছিলেন। এবার বোধহয় তিনি গাড়ি থেকে নামবেন। কিন্তু সীট ছেড়ে একটু ঠেলাঠেলি করে বুড়ী হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলেন এবং চীৎকার করতে লাগলেন। "ও দোকানী। দোকানী কোথায় গেলো?"

কাতর আর্তনাদ শুনে অনেকে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। হরিময়বাবু এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কোথাকার দোকানী খুঁজছেন? এখানে তো কোনো দোকানী নেই।"

সেই কথা শুনে বুড়ী তো হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন। "ওমা! কী কথা বলে গো। দোকানী নাকি নেই। আমার সব্বোনাশ হলো গো!"

পিকলু এবার বুড়ীকে সাহস দেবার জন্যে বললো, "কী হয়েছে আপনার ? ভয় কী ?"

পিকলুর হাত ধরে বুড়ী বললেন, "এই লোকটা কী বলে। এতো বড় দোকানে নাকি দোকানী নেই গো।"

পিকলু এবার গলা বাড়িয়ে কণ্ডাক্টরকে ডাকলো। ভিড় ঠেলে খাকি ইউনিফর্ম পরা কণ্ডাক্টর এসে বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলো, "কী হয়েছে ?"

বুড়ী যেন হাতে চাঁদ পেলেন। "ও দোকানী, তুমি ঝাঁপ ফেলে দিয়েছো কেন ? আমি যে বেরুবার দরজা খুঁজে পাচ্ছি না। আবার ওই নোকটা বলে যে দোকানীও নেই।"

ভিড়ের মধ্যে দরজা খুঁজে না-পেয়েই যে গাঁয়ের বুড়ী নার্ভাস হয়ে পড়েছেন তা বোঝা গেলো। গাড়ির মধ্যে অনেকেই হেসে ফেললো। কে যেন বলে উঠলো, "দোকানী নয়—কণ্ডাক্টর।"

গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বুড়ী ফোঁস করে উঠলেন। "আ মলো যা। এ্যাদ্দিন কালিঘাটে আসছি, আমাকে দোকানী শেখাচ্ছে।"

ট্রামযাত্রাটা বেশ রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে পিকলুর। দেড় হাজার লোক যেন একসঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে—কিন্তু সে একলা লড়ে যাচ্ছে।

বুড়ীর ভয়ে ভিড়ের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে হরিময়বাবু অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছিলেন। এবার তিনি কায়দা করে পিকলুর কাছে চলে এলেন। বললেন, "বম্বেতে নেই, কলকাতায় আছে—এমন আর-একটা আইটেম মনে পড়েছে। কালীঘাট—মা কালীর মন্দির। কালীঘাট থেকেই তো কলকাতা।"

কালীঘাটে নামবার আগেই আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটলো। কণ্ডাক্টর কয়েকবার টিকিট চাইতেই কদমছাঁট ও মর্কটমার্কা একটা লোক চোঙাটে প্যাণ্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলো। পকেট থেকে পয়সা বার করবার কোনো ইচ্ছেই যেন ছিল না লোকটার।

মানিব্যাগটার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন হরিময়বাবু। ওঁর চোখ দুটো চমচমের মতো হয়ে উঠলো। তারপর বললেন, "ইউরেকা।"

"হুকুম সিং হুঁশিয়ার।" এই বলে হরিময়বাবু মুহূর্তের মধ্যে মানিব্যাগ ও লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হৈ-হৈ কাণ্ড। লোকটার শার্টের কলার ধরে হুকুম সিং হিড়হিড় করে ট্রামের বাইরে নিয়ে এলো। পাবলিক বাধা দিলো না। কলকাতায় সাদা-পোশাকের পুলিসের মার্কামারা চেহারা। সবাই হুকুম সিংকে চিনে ফেলেছে।

"আমার মানিব্যাগ—লস্ট আটলাণ্টা, লস্ট আটলাণ্টা," হরিময়বাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন।

মানিব্যাগখানা লোকটার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হরিময়বাবু বললেন, "এই তো আমার ব্যাগ। বোতাম-দেওয়া পকেটে মায়ের জবাফুল রয়েছে দেখুন। দেখি-দেখি"—একটা গর্ত থেকে চমচম কাগজের ভিজিটিং কার্ডও বেরিয়ে এলো।

লোকটা বিপদ বুঝে বললো, "বিশ্বাস করুন সায়েব, ব্যাগে কিছুই ছিল না। সবশুদ্ধু সাতাশি পয়সা পেয়েছিলাম।"

কালীঘাটের কালী দেখা মাথায় উঠলো। বামাল চোর নিয়ে হুকুম সিং এখন থানায় যেতে চায়।

পিকলু অবাক। কী করে হরিময়বাবু নিজের হারানিধি ব্যাগ চিনতে পারলেন?
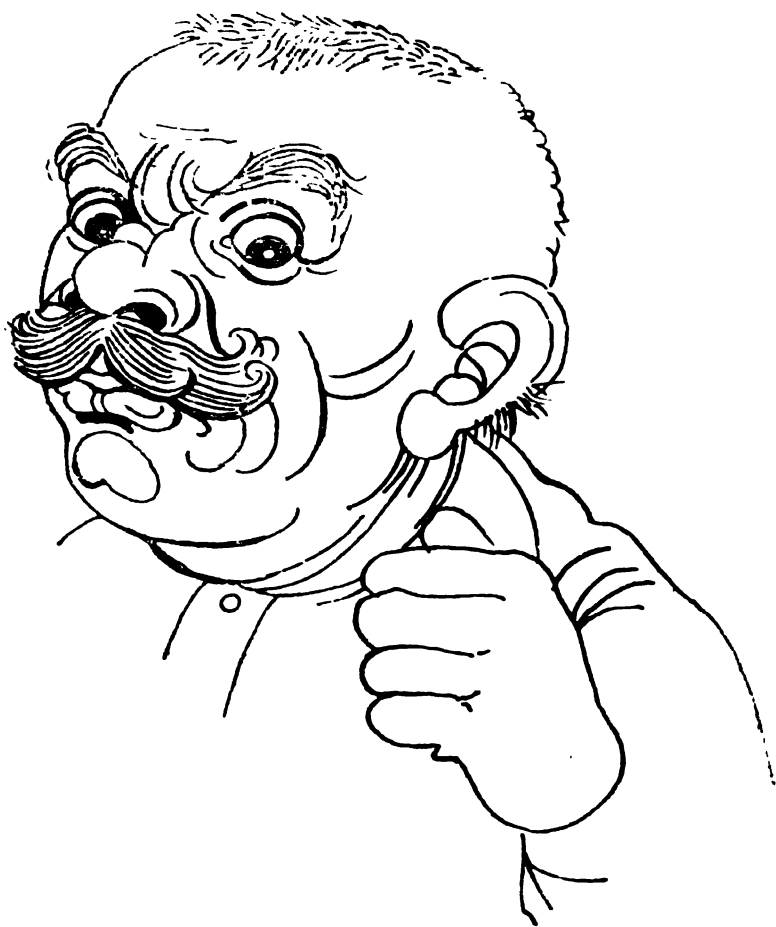
সগর্বে হরিময়বাবু নিবেদন করলেন : "খুব সহজে। আমার ব্যাগ যে চমচমের জন্যে স্পেশালি তৈরি। এই গ্যাখো—ব্যাগের দুধারে বড়-বড় করে লেখা রয়েছে চমচম! এই ব্যাগ যখন স্পেশালি তৈরি করেছিলাম তখন উদ্দেশ্য ছিল প্রচারের। দিনের মধ্যে কতবার কত জায়গায় মানিব্যাগ বার করে লেন দেন হচ্ছে। পরের মানিব্যাগের দিকে সবারই নজর থাকে। সুতরাং চমচম নামটা দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়বে।"

চোরকে ছেড়ে দেবার জন্যে হরিময়বাবু হুকুম সিংকে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। মনে-মনে হিসেব করে হরিময়বাবু বললেন, "সাতাশি পয়সার জন্যে জেলে যাওয়া পোষায় না।"

লোকটাও বেশ চালাক। সুযোগ বুঝে হরিময়বাবুকে সে বললো, "আমাকে হাজতে দিলে, ওই ব্যাগ ফেরত পেতে ছ'মাস লেগে যাবে হুজুর। কোর্ট-কাছারিতে যাবে ওই ব্যাগ।"

এবার বহু কষ্টে হুকুম সিংয়ের হাত থেকে লোকটাকে ছাড়ানো হলো। উত্তেজনায় হরিময়বাবুর টাকে ঘাম জমে গিয়েছে। বললেন, "পকেটমার ধরতে যা কষ্ট হয়েছিল তার থেকে ছাড়াতে বেশি মেহনত হলো।"

কালীঘাট দেখে পিকলুর মন ভরলো না। সে কলকাতার আরও অনেক কিছু দেখতে চায়।

খোকাবাবুকে এবার বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলো হুকুম সিং। কিন্তু খোকাবাবুর ইচ্ছে আজ সমস্ত দিন হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়াবে।

এবার হরিময়বাবু ও হুকুম সিং দুজনেই ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন।

হুকুম সিংয়ের বোধহয় আপিসে ডিউটি আছে। সায়েবের নাতিকে দেখবার জন্যে সে একবার ঝট করে চলে এসেছিল।

একটা দোকানে গিয়ে সে আপিসে ফোন করে দিলো। তেমন দেরি হলে সে আজ ছুটি নেবে—আপিসেই যাবে না।

একখানা মিনিবাস প্রায় পিকলুর নাকের ডগা স্পর্শ করে চলে গেলো। তার গায়ে লেখা: বিবাদী বাগ—টালিগঞ্জ। পিকলু যা দেখবে তার সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলবে। হুকুম সিংকে সে জিজ্ঞেস করে বসলো, "বিবাদী বাগ কেন নাম?"

পাজি চোর ডাকাত ধরতে হুকুম সিংয়ের জুড়ি নেই। কিন্তু সাধারণজ্ঞানের কোশ্চেন করলেই সে বেশ মুশকিলে পড়ে যায়। মাথা চুলকে সে বললো, "কোর্টে দো কিসিমের আদমি যায়—এক পার্টির নাম বাদী, যে মামলা করে; অন্য পার্টির নাম বিবাদী। সুতরাং বিবাদী বাগ নাম তার থেকেই হয়েছে।"

হরিময়বাবু একটা টেলিফোন করতে যাবেন ভাবছিলেন। হুকুম সিং সঙ্গে থাকলে টেলিফোনের মালিক ন্যায্যদামের বেশি নেবে না। হুকুম সিংয়ের ব্যাখ্যা শুনে তিনি বললেন, "হলেও হতে পারে। রহস্যময় কোনো শব্দ পেলেই আমি তার মূলে চলে যাই। বিবাদীর মধ্যে বিবাদ শব্দ রয়েছে—তার অর্থ ঝগড়া। মামলাও এক ধরনের ঝগড়া। সুতরাং যে বিবাদ করে সেই বিবাদী। যে-স্থানে বিবাদীকে বাগে পাওয়া যায়—যেমন কোর্ট, কাছারি, সরকারী আপিস—তাই বিবাদী বাগ।"

স্ট্যাণ্ডের কাছে বাস ধরবার জন্যে কোটপ্যাণ্ট পরে এক ভদ্রলোক

দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বললেন, "ছোট ছেলেকে কী সব বুঝোচ্ছেন? বিবাদী বাগ মানে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগান। মস্ত তিন বিপ্লবী ছিলেন—ইংরেজ আমলে রাইটার্স বিলডিংস আক্রমণ করেছিলেন। বাগ মানে বাগান।"

একগাল হেসে ফেললো হুকুম সিং। "হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে বটে। বিবাদী বাগ মানে ডালহৌসি স্কোয়ার।"

ব্যাপারটা নোটবইতে টুকে নিলো পিকলু। পকেটে সে ছোট্ট একটা নোটবই রাখে—কখন কী লেখবার দরকার হয় ঠিক নেই।

এবার টালিগঞ্জের মানে জিজ্ঞেস করে বসলো পিকলু। ওকে অন্যমনস্ক করে দেবার জন্যে হরিময়বাবু বললেন, "মানে জেনে কী হবে? তার থেকে চীনেবাদাম খাও।" পিকলু চীনেবাদামও নিলো এবং সেই সঙ্গে মানেও জিজ্ঞেস করলো।

হরিময়বাবু বললেন, "এসব কোশ্চেন আগাম জানলে আমি এবং হুকুম সিং দুজনেই পড়াশোনা করে বেরোতাম। টকাটক সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতাম—লালদিঘি কেন লাল নয়, গোলদিঘি কেন চৌকো বউবাজারে কেন বউ পাওয়া যায় না। তবে টালিগঞ্জের কোশ্চেনটা খু-উ-ব সোজা। কমনসেন্স থেকেই উত্তর দেওয়া যায়।"

সাহস পেয়ে হুকুম সিং বলে ফেললো, "এটা হামিও জানি। ওখানে অনেক টালি তৈরি হতো।"

হা-হা করে উঠলেন হরিময়বাবু। "মোটেই নয়। মাটি পোড়ানো টালির সঙ্গে টালিগঞ্জের কোনো সম্পর্ক নেই। ওখানে কর্নেল টলি নামে এক দুর্দান্ত সায়েব ছিলেন। তোমার দাদুর গতবছরের আগের বছরে লেখা উপন্যাসে এঁর কথা লেখা আছে।"

হুকুম সিং ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। খোকাবাবুর সঙ্গে সে একলা ঘুরতে খুব উৎসাহী নয়। তার ইচ্ছে হরিময়বাবুও সঙ্গে থেকে যান।

হরিময়বাবু বললেন, "ঝটপট তাহলে একবার চমচম অফিসটা ঘুরে আসা যাক। আমাকে এতোক্ষণ না-দেখে সহ-সম্পাদক বিজয় নিশ্চয় চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া আর্জেন্ট কোনো খবরাখবর থাকলেও জানা যাবে। তোমরাও ততক্ষণ বাড়ি ফিরে হোল-ডে প্রোগ্রামের জন্যে রেডি হয়ে নাও।"

কথা হলো, বাড়িতে খবর দিয়েই পিকলু ও হুকুম সিং সোজা চমচম অফিসে চলে আসবে।

পিকলুর দাদু অনেকক্ষণ ধরে ইজিচেয়ারে পাথরের মতো বসে আছেন। এই চেয়ারটা মন্ত্রপূত সিংহাসনের মতো। এখানে না-বসলে তাঁর মাথায় গল্পের প্লট আসে না। গত কুড়ি বছরে তিনি যত নামকরা গপ্পো-উপন্যাস লিখেছেন তার শুরু এবং শেষ এই ইজিচেয়ারেই।

গত সাতদিন ধরে এই চেয়ারে বসে তিনি একটা উপন্যাসের প্লট বুনবার চেষ্টা করছেন। কত বিচিত্র রঙিন চরিত্র পরীর মতো পাখা মেলে তাঁর মানসলোকে নেমে আসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই সুবিধে করতে পারছেন না তিনি। শুধু তো নানা রঙের মানুষ হলেই হলো না—একটা গল্পের দানা বেঁধে ওঠা প্রয়োজন। গল্পের একটা মনের মতো পরিণতি চাই।

গত কয়েক বছর ধরে ভবনাথ সেন যা লিখেছেন তার শেষে একটু দুঃখের ইঙ্গিত আছে।

এবারেও একটা দুঃখের গপ্পো ভাবছিলেন তিনি। সেই সময় পিকলু চলে এলো কলকাতায়। নাতনী শতরূপার শক্ত অসুখ। তাকে নিয়ে ওর বাবা-মা ভেলোর চলে গিয়েছে, আর পিকলুকে এক বন্ধুর সঙ্গে বম্বে থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে ভবনাথের কাছে।

ভবনাথ নিজের ছেলেকে সেইভাবেই লিখে দিয়েছিলেন : "আমরা

যখন রয়েছি তখন পিকলু যতদিন খুশী আমাদের কাছে থাক। তাছাড়া এখন যখন ইস্কুলের ছুটি রয়েছে ওর পড়াশোনার কোনো চিন্তা নেই।"

পিকলু এসেই দাদুর সঙ্গে অনেক গপ্পো করেছে। হাজার-হাজার লোক যে দাদুর গপ্পো পড়বার জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকে, তা পিকলু কিছুটা শুনেছে। কিন্তু পিকলু তার ঠাকুমাকে বলেই দিয়েছে, "দাদুর গপ্পো তার ভাল লাগে না। দাদুর থেকে অনেক ভাল গল্প জানে অধরদা। অধরদা ওদের বাড়ির চাকর।"

নাতির মন্তব্য শুনে সেদিন বাড়িতে বেশ চাঞ্চল্য। লেখকের নাতি বলে দিয়েছে—পদ্মশ্রী ভবনাথ সেনের থেকে চাকর অধরের গপ্পো ভাল। সবাই মিটি-মিটি হেসেছে।

একসময় ঠাকুমা জিজ্ঞেস করেছেন, হ্যাঁরে, তুই এমন কথা বললি কেন?

পিকলুর উত্তর খুব সোজা। দাদুর গপ্পে বড় দুঃখ থাকে। প্রথমে বেশ ঝলমলে লোকজন থাকে, বেশ আনন্দ হয়—তারপর কয়েকপাতা এগোলেই কী যে হয়, সবাই গম্ভীর হয়ে পড়ে। তারপর শেষের দিকে কী কষ্ট, কী কষ্ট! চোখে জল এসে যায়।

অথচ পিকলুর একদম কাঁদতে ইচ্ছে করে না। ভীষণ কষ্ট হয়। অধরদা যখর গপ্পো বলেন, তখন ঠিক উল্টো। প্রথমে একটু-একটু দুঃখু থাকে। কিন্তু পিকলু সেজন্যে চিন্তা করে না—সে জানে অধরদা যখন আছেন তখন একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই তাই হয়। শেষ পর্যন্ত কী হাসাহাসি, কী মজা। বন্দিনী রাজকন্যার সঙ্গে অচিন দেশের রাজপুত্রর বিয়ে হয়ে যায়, হিংসুটে রানীর দুষ্টুমি ধরা পড়ে, দুয়োরানীর দুঃখ শেষ হয়, লোভী রাক্ষস শাস্তি পায়, গুপ্তধনের সন্ধানে বেরিয়ে ছেলেরা নিরাশ হয়ে ফিরে আসে না, মুঠো-মুঠো

মারবেল-সাইজের হীরায় তাদের হাফ্-প্যাণ্টের পকেট ফুলে ওঠে।

পিকলুর কথাবার্তা ভবনাথকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। মনে-মনে ভেবে দেখলেন, নিজের অজ্ঞান্তেই তিনি পরের পর দুঃখের গপ্পো লিখে গিয়েছেন। কিছু লোকও আছে যারা নিমপাতা এবং উচ্ছে খেতে এবং দুঃখের গপ্পো পড়তে ভালবাসে। তারাই মোহিত হয়ে ভবনাথকে লম্বা-লম্বা চিঠি লিখেছেন এবং ভবনাথকে বিপথে চালিত করেছেন। কিন্তু এবারে ভবনাথ ভাবছেন, পিকলুর মুখে যে-করেই হোক হাসি ফোটাবেন তিনি।

কিন্তু ওই পর্যন্ত এসেই তিনি আটকে গিয়েছেন। গত এক সপ্তাহ ধরে কল্পনার সরস্বতীকে তিনি কতভাবে আহ্বান করলেন—কিন্তু নির্মল আনন্দের গল্প কলমে ধরা দিয়েও ধরা দিচ্ছে না। গোড়ার দিকে চরিত্রগুলো তাঁর কল্পলোকে বেশ হাসিখুশী থাকে—কিন্তু তারপর হঠাৎ কী যে হয়, দুঃখের ঘন কালো মেঘে তাঁর মনের আকাশ ছেয়ে যায়। ভবনাথ এখন বুঝতে পারেন, দুঃখের কথা লেখা সবচেয়ে সহজ। কিন্তু এবার তিনি আনন্দ ছাড়া আর কিছুই লিখবেন না। ভোরের আলোর মতো প্রসন্ন ঝলমলে আনন্দ চাই তাঁর।

তার ফলে এক সপ্তাহ নিষ্ফলা কেটে গেল। ভবনাথ কিছুই করতে পারছেন না। চমচম পত্রিকার সম্পাদক হরিময়বাবু সেবার এসে জোর করে আগামী উপন্যাসের বিষয়টা জানতে চাইলেন। ভবনাথ সেনের মতো লেখকের মাথায় যে গল্প শুকিয়ে গিয়েছে, এ-কথা হরিময়বাবু বিশ্বাস করেন না। হরিময়বাবুর ধারণা ভবনাথ একটা আপেলগাছের মতো—ডালে-ডালে অসংখ্য গল্পের রঙিন আপেল ঝুলে রয়েছে, একটা ছিঁড়ে সম্পাদককে দিয়ে দিলেই হলো।

বাধ্য হয়ে হরিময়ের হাতে এক টুকরো কাগজে ভবনাথ একটা

নাম লিখে দিয়েছেন। হরিময়বাবু বোধহয় উপন্যাসের নামটা আগাম প্রচার করতে চান।

কাগজের টুকরোর দিকে তাকিয়ে হরিময়বাবু তো আনন্দে ও বিস্ময়ে হতবাক। বললেন, "দুর্দান্ত! ভাবা যায় না! বুঝতে পারছি কেলেংকেরিয়াস কিছু ঘটবে।"

"কী ঘটবে আমি নিজেই কিন্তু জানি না, হরিময়।" ভবনাথ সেন করুণভাবে বলেছিলেন।

কিন্তু চমচম-সম্পাদক তা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, "'খারাপ লোকের খপ্পরে' নামেতেই ছেলে এবং বুড়ো সবাইকে বেঁধে ফেলেছেন। প্রকাশের পূর্বেই চমচম নিঃশেষিত হবে বুঝতে পারছি।"

এসব কথা শুনতে কোন লেখকের না ভাল লাগে? কিন্তু ভবনাথ সেন মোটেই শান্তি পাচ্ছেন না—গল্পটা আবছাভাবেও মনের মধ্যে ফুটে উঠছে না।

সাধারণতঃ গল্পগুলো অদ্ভুতভাবে ভবনাথের মাথায় এসে যায়। এই চেয়ারে বসে ভবনাথ মিনিট কয়েক একমনে গড়গড়ায় টান দিয়ে যান। আশে-পাশে একটা পাতলা ধোঁয়ার মশারি তৈরি হয়ে যায়। সবকিছু একটু অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এমন অবস্থায় ভবনাথ চোখ বন্ধ করেন—চোখবন্ধ অবস্থায় আরও কয়েকবার গড়গড়ায় টান দেন। ঠিক সেই সময় চোখের সামনে ভবনাথ বিরাট একটা রূপালী পর্দা দেখতে পান। ঠিক যেন সিনেমা হল্-এ বসে আছেন ভবনাথ। তিনি ছাড়া হল্-এ কিন্তু একজনও দর্শক নেই। যেন ওঁর জন্যেই কেউ স্পেশাল শোয়ের ব্যবস্থা করেছে। এই অবস্থায় আস্তে-আস্তে পর্দার ওপর কয়েকটা মুখ ফুটে ওঠে। অস্পষ্ট অন্ধকারে ছবি শুরু হয়ে যায়। চরিত্রগুলো আপনা-আপনিই কাজকর্ম

শুরু করে, ভবনাথকে কিছুই বলতে হয় না। তিনি হাত-পা গুটিয়ে স্রেফ দর্শকের আসনে বসে আছেন। অবশেষে শেষটাও দেখতে পান ভবনাথ। গল্পোটা পুরো জানা হয়ে যায় ভবনাথের। তখন তিনি আবার গোড়া থেকে ছবিটা দেখতে শুরু করেন—গল্পের যা-কিছু ফুটো থাকে এবার তিনি মেরামত করে নেন।

এরপর কোনো অসুবিধা হয় না ভবনাথের। গড়গড়ার নল সরিয়ে রেখে, কলম খুলে কাগজের ওপর তিনি যখন প্রথম লাইনটা লেখেন, তখন গল্পের শেষ লাইনটাও তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আজ তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। কল্পনার ছোট্ট টুনটুনি পাখিটা তাঁর কাছে কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। মনের এই অবস্থায় ভবনাথের অন্য কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হয় না। কাজ তো দূরের কথা, খাবারেও রুচি থাকে না ভবনাথের। শুধু ওই গড়গড়াটুকু ছাড়া। তাও যেন আজ সকাল থেকে বিস্বাদ লাগছে।

পিকলুর কথাটা গিন্নী এমনভাবে শুনিয়ে গেলেন, যেন বাড়িতে নাতির উপস্থিতি সম্বন্ধে ভবনাথের হুঁশ নেই। কথাটা মোটেই সত্যি নয়। পিকলুর জন্যে ভবনাথ মনে-মনে অনেক পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন—কোথায়-কোথায় ওকে নিয়ে যাবেন, চিড়িয়াখানার কোন-কোন পশুর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেবেন। বোটানিক্যাল গার্ডেন, মিউজিয়ম, প্ল্যানেটোরিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ন্যাশনাল লাইব্রেরি ইত্যাদির লিস্টিও তৈরি করেছিলেন। ভবনাথ ভেবেছিলেন এবার তাঁর নাতির সঙ্গে বাঘা-বাঘা লেখকদের আলাপ করিয়ে দেবেন। দিনকয়েক নাতির সঙ্গে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো কাজই রাখবেন না। দরকার হলে সবাই মিলে লাক্সারি বাসে একবার দীঘাও ঘুরে আসবেন।

কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। গল্পের সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে উঠছে। মেজাজটা যেরকম তেঁতো হয়ে আছে তাতে মাথা দিয়ে কীভাবে মজার গপ্পো বেরুবে তা ভবনাথ বুঝতে পারছেন না। কিন্তু ভবনাথের পণ, এবার কিছুতেই দুঃখের গপ্পো নয়।

আজ সকালে পিকলুর ঠাকুমার সঙ্গে কিছুটা রাগারাগি হলো। রাগটা আরও কোথায় গড়াতো ঠিক নেই। পিকলুর ঠাকুমা সত্যিসত্যিই হয়তো বউমার বাবা অর্থাৎ রঞ্জন সেনকে লালবাজারে খবর দিতেন। পুলিশের হাই-অফিসারের সামনে তিনি স্বামীর সমালোচনা করতেন।

শহরের চোর জোচ্চোর গুণ্ডা জালিয়াত ঠগ ইত্যাদি ধরবার কাজে পিকলুর পুলিস-দাদু সারাক্ষণ ব্যস্ত। রাত্রে শোবার সময়েও ওঁকে বিছানার পাশে টেলিফোন রাখতে হয়। রাস্তায় যখন বেরোন তখনও গাড়িতে একটা বেতার টেলিফোন থাকে।

সেবার এখানে রঞ্জনবাবু খেতে এলেন। দশ মিনিট কথাবার্তার পরে সবে রাতের খাবারে হাত দিয়েছেন ভদ্রলোক, অমনি হুকুম সিং এসে খবর দিলো চার্লি পিটার ওয়ারলেসে ডাকছে। চার্লি পিটার নিশ্চয় কলকাতা পুলিসের কোনো কোড-ওয়ার্ড। ওয়ারলেসে নিশ্চয় খুবই জরুরী কোনো খবর এলো—কারণ খাওয়া শেষ না-করেই রঞ্জন সেন অফিসে ফিরে গেলেন।

পিকলুর ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, "রাত আটটা বেজে গিয়েছে—এখন আবার আপিস কী?"

রঞ্জন সেন দুঃখ করে বললেন, "আমরা হলাম চব্বিশ ঘণ্টার চাকর। আমাদের দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, দুপুর নেই। দুষ্টু লোকরা তো অফিসের ঘড়ি ধরে দুষ্টুমি করে না!"

তবু রঞ্জন সেন আর একদিন পিকলুকে দেখতে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, তেমন হলে পিকলুর জন্যে তিনি দু-একদিন ছুটি নেবেন।

“আপনি কেন শুধু-শুধু ছুটি নেবেন? চিরছুটির লোক তো আপনার সামনেই বসে রয়েছেন। উনি আপিস যান না, রেডিও টেলিফোনে কথা বলেন না। অথচ বড়-বড় বিমান-বম্বেটেদের কলমের এক খোঁচায় উনি পাকড়াও করেন, কেউ ওঁর হুকুমে রাজা হয়, কেউ ফকির।” একটু রেগেই কথাগুলো বলেছিলেন পিকলুর ঠাকুমা।

রঞ্জন সেন হেসে ফেলেছিলেন এবং আচমকা বিদায় নেবার আগে বলেছিলেন, “সাহিত্যিকের সঙ্গে কলকাতা ঘুরে বেড়ানো আর পুলিসের সঙ্গে কলকাতা দেখা তো এক জিনিস নয়। আমরা মানুষের খারাপ দিকটাই জানি—কোথায় খুন হয়, কোথায় ছিনতাই হয়, কোন জায়গাটা কোন সময় বিপজ্জনক বলতে পারি। কিন্তু ভবনাথবাবুর চোখে এ-সব জায়গাই অন্যরকম হয়ে উঠবে।”

এরপরেই পিকলুর ছোট দাদু হুড়মুড় করে বিদায় নিয়েছিলেন। ভবনাথের লেখার মস্ত ভক্ত তিনি। আজকাল তিনি ভুলেও বড়দের বই পড়েন না। সময় পেলেই ছোটদের গপ্পোর বই খুলে বসেন।

ভবনাথ ভেবেছিলেন, দু-একদিনের মধ্যেই চমচমের উপন্যাসটার একটা ছক মনে এসে যাবে এবং তখন তিনি পিকলুর ঠাকুমাকে দেখিয়ে দেবেন, কত হৈ-চৈ তিনি নাতির সঙ্গে করতে পারেন।

কিন্তু আজও ভবনাথের মনের মধ্যে রোদ উঠলো না। পিকলুর ঠাকুমা হয়তো আজ আরও রেগে যেতেন, হয়তো তিনি রঞ্জনবাবুকেই ছুটি নেবার জন্যে খবর পাঠাতেন। ভাগ্যে হুকুম সিং এবং চমচম-সম্পাদক হরিময়বাবু প্রায় একই সঙ্গে বাড়িতে হাজির হয়েছিল।

হরিময় লোকটি বেশ—ছেলেদের সত্যিই ভালবাসেন। ভবনাথের সঙ্গে গ্রাম-সম্পর্কে একটা আত্মীয়তাও আছে। যেটা ভবনাথের খুব ভাল লাগে, ছোটখাট সব ব্যাপারেই হরিময়ের উৎসাহ আছে। কোন জনপ্রিয় কাগজের সম্পাদক এইভাবে স্রেফ মজার সন্ধানে একটা এগারো বছরের ছেলের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন ?

হরিময়বাবু এক কাজে বেরিয়ে একেবারে অন্য কাজে জড়িয়ে পড়তে আপত্তি করেন না। ওই তো উনি এসেছিলেন—ভবনাথের আগামী উপন্যাসের কিছুটা অংশ নেবার জন্যে, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোনো কথা না-তুলেই চলে গেলেন পিকলুর সঙ্গে।

সেবার আদালতে সাক্ষী দেবার জন্যে বেরিয়ে হরিময়বাবু ভুলে মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সাড়ে-চার ঘণ্টা লাইন দেবার পরে মাঠের মধ্যে ঢুকে ওঁর খেয়াল হলো, পকেটে সাক্ষীর সমন রয়েছে। ইতিমধ্যে জজ রেগে গিয়ে ওঁকে ধরে আনবার জন্যে ওয়ারেন্ট বার করে দিয়েছেন। ভবনাথবাবু ছাড়া কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে, উনি স্রেফ ভুল করে খেলার মাঠে লাইন দিয়ে বসেছিলেন।

আজকে পিকলুর সঙ্গে বেরিয়ে হরিময়বাবু ভুলোমনে কিছু করতে পারবেন না—কারণ সঙ্গে হুকুম সিং আছে। পুলিসের লোকরা ঠিক হরিময়বাবুর উল্টো। কোথায় যেতে হবে, কতক্ষণ থাকতে হবে, কী করতে হবে, সব ওদের নোটবুকে টপাটপ লিখে নেয়—ভুল হবার কোনো সুযোগই থাকে না। হরিময়বাবু ও হুকুম সি, এদের দুজনকে নিয়ে এবারের গপ্পোটা লিখতে পারলে কী হয় ? ভবনাথ হঠাৎ ভাবলেন।

পিকলুকে নিয়ে হুকুম সিং ও হরিময়বাবু বেরিয়ে যাবার পরেও ভবনাথ সেন নিজের চেয়ারে অনেকক্ষণ হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তারপর ভাবলেন, কিছুক্ষণের জন্যে বাইরের হাওয়া গায়ে লাগানো যাক। মনটা নতুন সৃষ্টির জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পিকলুর ঠাকুমা দূর থেকে ব্যাপারটা দেখলেন। তিনি যে কী ভাবলেন, তা ভবনাথ আন্দাজ করতে পারছেন। ওঁর বক্তব্য, "যদি বেরোবেই, তাহলে নাতিকে সঙ্গে নিয়েই বেরুলে না কেন?"

কিন্তু ভবনাথের এই বেরুনোটা বেরুনো নয়—স্রেফ অশান্ত মনকে একটু শান্ত করবার চেষ্টা। দু'পা গিয়েই হয়তো তিনি ফিরে আসবেন।

হলোও তাই। রাস্তায় চলমান জনস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েও শান্তি পেলেন না ভবনাথ। মাথায় গল্পটা এখনও পেকে উঠছে না।

ঠিক সেই সময় ভবনাথ দেখলেন, একটা লোক মই এবং বালতি হাতে উঁচু জায়গায় পোস্টার লাগাচ্ছে। চমচম পত্রিকার পোস্টার না? হ্যাঁ, তাঁর দেওয়া নামটাই তো বড়-বড় করে ঘোষণা করা হয়েছে। যে উপন্যাসের একটা লাইনও তিনি এখনও লেখেননি। ভবনাথ সেনের মাথাটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। কাছাকাছি যে একটা বিরাট গর্ত ছিল ভবনাথ লক্ষ্য করেননি। পা-টা আচমকা সেখানেই পড়লো। আর-একটু হলেই ভবনাথ সেন দড়াম করে পড়তেন। বড় রকমের বিপদ হয়নি, কিন্তু গোড়ালিটা মনে হচ্ছে মুচকেছে যন্ত্রণা সহ্য করে ভবনাথ কোনোরকমে বাড়ির দিকে এগোলেন।

ঠিক সেই সময় একজন চেনা লোক একগাল হেসে ভবনাথকে বললো, "চমচমের বিজ্ঞাপন দেখলুম। এবারে খু-উ-ব হাসির গপ্পো হবে মনে হচ্ছে!"

হাসতে পারলেন না ভবনাথ—মন এবং পা একই সঙ্গে দপ দপ করছে!

বাড়ি ফিরেই পিকলু ও হুকুম সিংকে ভবনাথ দেখতে পেলেন। ওরা দুজনেই দ্রুতবেগে দুপুরের খাওয়া সেরে নিচ্ছে।

ইমপিরিয়াল গোঁফখানা বাঁচিয়ে খেতে হচ্ছে হুকুম সিংকে—ফলে সে পিকলুর সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। অন্যদিনে পিকলুর খেতে অনেক সময় লাগে। ওর একটা বদ-অভ্যাস আছে—মাকে এই বয়সেও খাইয়ে দিতে হয়। এখানেও ঠাকুমা প্রতিদিন কাজটা করছিলেন। কিন্তু আজ পিকলু ও হুকুম সিং দুজনেই বোম্বাই মেলের স্পিডে খাচ্ছে। দুজনের মধ্যে বেশ কমপিটিশন লেগে গিয়েছে। ডালের বাটিতে চুমুক দিতে গিয়ে হুকুম সিংয়ের ইমপিরিয়াল গোঁফের দশ পার্সেণ্ট হলদে হয়ে গেলো।

ঠাকুমা সানন্দে জানিয়ে দিলেন, "ওদের একটুও সময় নেই। এখনই ওরা বেরুবে।"

হরিময়বাবুর খোঁজ করলেন ভবনাথ। পিকলু জানালো, খাওয়া শেষ করেই রিকশ নিয়ে ওরা হরিময়বাবুর বাড়ি চলে যাবে।

ঠাকুমা বললেন, "ওঁকেও নিয়ে এলে পারতিস, যা-হয় দুমুঠো এখানে খেয়ে নিতেন।"

হুকুম সিং গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো, "বুড়া সায়েবের সময় নেই। সাহা সম্পাদকের সঙ্গে জরুরী মুলকাত করবেন এবং পিকলুবাবুর জন্যে বসে থাকবেন।"

পিকলু হেসে বললো, সাহা সম্পাদক নয়। যিনি সম্পাদককে কাগজ বার করতে সাহায্য করেন তাঁর নাম সহ-সম্পাদক "

দাদুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে একগাল হেসে পিকলু বললো, "দাদু,

রাস্তায় আজ অনেক মজা হয়েছে। পকেটমার পর্যন্ত। এর আগে আমি কখনোই জ্যান্ত পকেটমার দেখিনি।"

"অ্যাঁ! বেচারা হরিময়বাবুর পকেট নিশ্চয়।" বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন ভবনাথ।

পিকলু হেসে আশ্বাস দিলো, "কিছু ভেবো না দাহু! পকেটমারের প্রত্যাবর্তন, ভীষণ মজার ব্যাপার।"

পিকলু এখন বেশ খুশী মেজাজে রয়েছে। হুকুমচাচাকে সে জিজ্ঞেস করলো, "এখন কী খাওয়া হলো?"

একগাল হেসে হুকুম উত্তর দিলো, "খানা! তবে সায়েব বোলেন লাঞ্চ।"

পিকলু বললো, "এর নাম ব্রাঞ্চ—সকালের ব্রেকফাস্ট এবং হুপুরের লাঞ্চের মধ্যে বলে বম্বেতে নাম দিয়েছে, ব্রাঞ্চ!"

পিকলু দ্রুত বেরিয়ে যেতে-যেতে বললো, "আমরা কোথায় যাবো, কী করবো এসব কিছুই ঠিক নেই। আমরা চলি—হরিময়দাহু নিশ্চয় এতোক্ষণ ছটফট করছেন।"

"তোমরা আমাদের জন্যে ভেবো না।" বক্স ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে পিকলু হৈ-হৈ করে উঠলো। ওর আনন্দ দেখে ঠাকুমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

পিকলুর সঙ্গে হরিময়বাবু ও হুকুম সিং রয়েছে, ভবনাথবাবুর আর কোনো ভাবনাই হচ্ছে না।

ঠাকুমা শুধু বললেন, "তুমি একটা রেনকোট নাও। ঘনঘন তোমার সর্দি হয়। বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা লাগলেই মুশকিল।"

পিকলু ওসব শুনলো না। ক্যামেরা কাঁধে হুড়মুড় করে সে বেরিয়ে পড়লো।

তাঁর নাতিটি বেশ ব্রাইট, ভবনাথ মনে-মনে ভাবলেন। রেনকোট না নিয়ে ঠাকুমাকে কেমন বলে গেলো, "সর্দির সঙ্গে ঠাণ্ডার, বৃষ্টিতে ভেজার কোনো সম্পর্ক নেই।"

ঠাকুমা অবাক হয়ে বললেন, "এক রত্তি ছেলে, বলে কী! জলে ভিজলে নাকি সর্দি হয় না।"

পিকলু চিৎকার করে বললো, "সর্দি হয় ভাইরাস থেকে।"

ভবনাথ আবার নিজের ভাবনার মধ্যে ডুব দিলেন। হুকুম সিং ও হরিময়বাবু ক্যারাকটার দুটো বেশ। গপ্পোটা যদি মাথায় এসে যায় তাহলে হরিময়বাবুর নামটা পাল্টে লিখবেন রসময়বাবু।

চোখ বন্ধ করলেন ভবনাথ। কিন্তু মাথায় কিছু আসছে না। শুধু খবরের কাগজে ওই সর্দি ভাইরাস চুরি যাবার খবরটাই বড়-বড় অক্ষরে চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

হুকুম সিংয়ের যা স্বাস্থ্য। রিকশয় উঠলে প্রায় সীটখানাই বোঝাই হয়ে যায়। পিকলু যদি রোগা না-হতো তাহলে বেশ মুশকিল হতো, একখানা রিকশয় ধরতো না।

রিকশওয়ালা সব রকম আইন বাঁচিয়ে রীতিমতো জোরে গাড়ি চালাচ্ছে। হুকুম সিংকে দেখেই সে সেলাম করেছে—প্লেন ড্রেস হলেও পুলিসদের চিনতে রিকশওয়ালাদের এক মিনিটও সময় লাগে না।

চমচম অফিস ও হরিময়বাবুর বাসস্থান একই ঘরে। ঘরের বাইরে বাংলায় বড় করে লেখা আছে : ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরী।

কিন্তু হরিময়বাবু বেশ বিপদে ফেলে গিয়েছেন। তিনি আপিসে নেই। পিকলুর ডাক শুনে ভিতর থেকে একজন চড়া গলায় জানালো তিনি গড়িয়া গিয়েছেন। হুকুম সিং অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সে ভারি গলায় ডাকাডাকি শুরু করলো। এবার হরিময়বাবুর রাঁধুনি, তথা চাকর, তথা চমচম পত্রিকার সহ-সম্পাদক বিজয় বেরিয়ে এলো। বেশ স্টাইলের সঙ্গেই বিজয় দরজা খুলেছিল, কিন্তু হুকুম সিং-এর ইমপিরিয়াল গোঁফ দেখে সে বেজায় ঘাবড়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে কথা পাল্টে বিজয় বললো, "হরিময়বাবু হঠাৎ দমদম চলে গিয়েছেন।"

"সে কী! আমাদের যে এখানে আসবার কথা।" হরিময়বাবু যে বেশ ভুলো তা পিকলু এবার আন্দাজ করতে পারছে।

বিজয় নিজেও খুব রেগে গেলো হরিময়বাবুর ওপর। বললো, "আপনাদের আসতে বলেছেন এখানে? এই রকম ভুলো লোক কীভাবে যে চমচমের মতো কাগজ চালান।"

কী করবে পিকলু গালে হাত দিয়ে ভাবছে।

বিজয় বললো, "দুঃখু করবেন না। এ তো কমের ওপর দিয়ে গেলো। সেবার ওঁর ভাগ্নীকে শ্রীরামপুর নিয়ে যাবেন বলে হাওড়া স্টেশনে বড় ঘড়ির তলায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। এমনি ভুলো লোক যে, টিকিট-ঘর থেকে বেরিয়ে ভাগ্নীকে না-নিয়ে সোজা ট্রেনে গিয়ে উঠলেন। রিষড়া স্টেশন পেরিয়ে শ্রীরামপুরে নামার আগে ওঁর খেয়াল হলো ভাগ্নীকে হাওড়া স্টেশনে বড় ঘড়ির তলায় দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছেন।"

পিকলু এতোটা বিশ্বাস করতে চায় না। হরিময়বাবুকে যতটা দেখেছে সে, তাতে খুবই নির্ভর করা যায় ওঁর ওপর।

পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্যে গোঁফ নাড়িয়ে হুকুম সিং এবার বিজয়কে জেরা শুরু করলো, "কেয়া হুয়া থা?"

পুলিসী জিজ্ঞাসাবাদে কে না ভয় পায়? বিজয় ভয়ে-ভয়ে বললো, "বাবু এসেই বললেন, 'বেজা, তাড়তাড়ি ভাত বাড়। আমি এখনই বেরুবো।' গোটাকয়েক চিঠি এবং টেলিগ্রাম এসেছিল। সেগুলো দেখতে-দেখতে কী যে হলো, বাবু বললেন, 'বেজা, ভাত থাক। আমি একবার এয়ারপোর্ট যাচ্ছি। শিশুবন্ধু পত্রিকা থেকে যদি কেউ খোঁজ করে, তাহলে বলবি আমি গড়িয়া গিয়েছি।' "

বিজয় স্বীকার করলো, তার উপর হরিময়বাবুর পাকাপাকি নির্দেশ আছে, বিপক্ষকে সব সময় ভুল পথে চালিত করতে হবে। হরিময়বাবু উত্তরে গেলে বলতে হবে তিনি দক্ষিণে গিয়েছেন। ঘুমোলে বলতে

হবে জেগে আছেন, জেগে থাকলে বলতে হবে ঘুমোচ্ছেন।

অপরিচিত কণ্ঠস্বর বুঝতে না-পেরে বিজয় তাই পিকলুকে বলেছিল হরিময়বাবু গড়িয়া গিয়েছেন।

পিকলুর মাথায় এবার একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। সে শুনেছে, কলকাতার নতুন বিমানবন্দরখানা দারুণ হয়েছে। কিন্তু কখনও দেখা হয়নি। পিকলু এবার বললো, "হুকুম-চাচা, চলো আমরা ট্রামে চড়ে এরোপ্লেন দেখে আসি।"

হুকুম-চাচা খুব উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। ওখানকার থানা আবার কলকাতা পুলিসের এক্তিয়ারে নয়। তাছাড়া ট্রামে চড়ে দমদমে যাওয়া যায় না।

কিন্তু পিকলু নাছোড়বান্দা। দমদমে বিরাট-বিরাট প্লেনগুলো সে দেখতে চায়, তারপর বোম্বাইয়ের সান্টাক্রুজের সঙ্গে দমদমের তুলনা করবে।

দমদমের একখানা মিনিবাস থামালো হুকুম সিং এবং পিকলুকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লো। হাত তোলার ভঙ্গী দেখেই মিনিবাসের সদাসতর্ক ক্লিনার ও কণ্ডাক্টর ইতিমধ্যেই হুকুম সিংকে চিনে ফেলেছে। কণ্ডাক্টর গলা খ্যাকারি দিয়ে বললো, "সরষের মধ্যে ভূত।" ইঙ্গিতে তারা ড্রাইভারকে সাবধানে বাস চালাতে বললো। ভি-আই-পি রোড ধরে মিনিবাস-ড্রাইভারের বোধহয় খুব জোরে গাড়ি চালাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গাড়িতেই পুলিস আছে জানতে পেরে বেচারা মনমরা হয়ে গেলো। কণ্ডাক্টরকে ডেকে গেঞ্জিপরা মিনিবাস-ড্রাইভার বললো, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়।"

কণ্ডাক্টর সবিনয়ে এসে খোঁজ করলো হুকুম সিংজী কতদূর যাবেন।

ভেবেছিল দু-এক স্টপ পরেই তিনি নেমে যাবেন। একেবারে দমদম এয়ারপোর্ট শুনে সে দুঃখ করে ড্রাইভারকে খবর দিলো, "পুরো সন্ধ্যে।"

পিকলু উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, "এখানে বাঘের ভয় আছে বুঝি?"

কণ্ডাক্টর ফিক করে হেসে বললো, "না, আমরা অন্য বাঘের কথা বলছি।"

এয়ারপোর্টে নেমে বিরাট ইন্দ্রপুরী দেখে পিকলু অবাক হয়ে গেলো। বোম্বাইয়ের সাণ্টাক্রুজ এই বাড়িটার কাছে শিশু।

হুকুম সিংও একজন প্লেন-ড্রেস বন্ধুকে দেখে খুব খুশী হলো। পিকলুর পরিচয় দিয়ে হুকুম সিং বললো, "ডি-সি সায়েবের নাতি। হাওয়াই আড্ডা দেখতে এসেছে বোম্বাই থেকে।"

"কেন? বোম্বাইতে এয়ারপোর্ট নেই?" ললিতবাবু জিজ্ঞেস করলেন। ললিতবাবুও কলকাতা পুলিসের কনস্টেবল। কিন্তু এই যে হুকুম-চাচা বললো দমদম কলকাতার এক্তিয়ারের বাইরে।

হুকুম সিং ফিসফিস করে পিকলুকে বঝালো, "ওরা 'সেক্রেটারি' কনট্রোলের লোক। যেখানে তোমার দাদু আগে ছিলেন।"

পিকলু হেসে ফেললো। "সিকিউরিটি কনট্রোল। যারা বিদেশীদের ওপর নজর রাখে।"

ললিতবাবু আদি দেশ নিশ্চয় বাংলাদেশ। উনি বললেন, "আমি এখন হাই-যাঃ ডিউটিতে আছি।"

হাই-যাঃ! সে আবার কি কাজ? পিকলু বুঝতে পারছে না। ললিতবাবু তখন ব্যাখ্যা করলেন, "উচ্চারণটা খটমট—কেউ-কেউ বলে হাইজ্যাক। বিমান ছিনতাই।"

হাইজ্যাক ব্যাপারটা পিকলু অবশ্যই জানে। কিন্তু হুকুম-চাচা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। "ভি-আই-পি রোডেও ছিনতাই হয়—পিলেন ছিনতাই। আর এয়ারপোর্টে ইস্পেশাল ছিনতাই।"

"ডেনজারাস জিনিস। বিমানদস্যুরা প্লেনকে প্লেনই ছিনতাই করবার তালে আছে," ললিতকাকা চোখ বড়-বড় করে বোঝালেন পিকলুকে।

তারপর ললিতকাকা বললেন, "আমি যখন রয়েছি, তখন এয়ারপোর্টের সবই দেখিয়ে দেবো। কেমন করে প্লেন নামে, কী করে ওঠে, কী ভাবে যাত্রীদের সার্চ করা হয়।"

এয়ারপোর্ট ঘুরে দেখতে-দেখতেই, একসময়, তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ ভেসে এলো। স্বরটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, অথচ মানুষটাকে দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। "পিকলু—মিস্টার পিকলু না?"

আরে, এ যে হরিময়বাবু! টাকমাথায় একটা ফরেন টুপি পরায় তাঁকে চেনাই যাচ্ছিল না। টুপিটা খুলে ললিতবাবুর দিকে ইংলিশ স্টাইলে টাক মাথা নত করলেন হরিময়বাবু, তাই পিকলু সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারলো।

হরিময়বাবুর পাশে আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখা গেলো। ওঁরা দুজনে এয়ারপোর্ট রেস্তরাঁয় বসে কোকোকোলা খাচ্ছেন।

হরিময়বাবু ঝটপট পিকলু ও হুকুম সিং-এর পরিচয় দিলেন। ললিতকাকুর পরিচয়টা পিকলু নিজেই দিয়ে দিলো।

সঙ্গের ভদ্রলোক রসিকতা করলেন, "ভাগ্যে আমাদের প্লেনটা হাই-যাঃ হয়নি—হলে আপনার কাজ বেড়ে যেতো।"

ললিতবাবু হাসলেন বটে, কিন্তু এ ধরনের অলুক্ষুণে কথা যে তাঁর

মোটেই ভাল লাগে না তা ওঁর স্পেশাল মুখভঙ্গীতেই বুঝিয়ে দিলেন।

হরিময়বাবু এবার হাসিমুখে এবং সগর্বে বললেন, "মীট মাই ভাইপো—রামানুজ চৌধুরী। একসময় চমচম পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিল। এখন বহুকাল ধরে ফরেনে আছে!"

রামানুজ নামখানা বেশ নতুন ধরনের মনে হচ্ছে। হরিময়বাবু ব্যাখ্যা করলেন, "রামের অনুজ অর্থাৎ ছোটভাই অর্থাৎ লক্ষ্মণ। সুতরাং ভুলে গেলে ইজিলি লক্ষ্মণ বলে ডাকতে পারো, কোনো অসুবিধে হবে না।"

রামানুজবাবু ইতিমধ্যে কখন রেস্তরাঁর বেয়ারাকে চোখের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আরও তিনখানা বরফ-ঠাণ্ডা বোতল নিয়ে এসে সে ভটাভট খুলে দিলো।

হুকুম সিংয়ের আবার পাইপ ঢুকিয়ে কোকাকোলা খাওয়ার অভ্যাস নেই। তাই বোতল থেকেই খাওয়া আরম্ভ করলো সে—ফলে ইমপিরিয়াল গোঁফটার তলার অংশ ভিজে লালচে হয়ে উঠলো।

জেনুইন মাল মনে হচ্ছে, কারণ হুকুম সিং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনখানা প্রমাণ সাইজের ঢেকুর তুলে হ্যাটট্রিক করলো।

এয়ারপোর্ট রেস্তরাঁয় ছোট্ট টেবিল ঘিরে ওঁরা কয়েকজন বসে-বসে কোল্ড ড্রিংকস খাচ্ছেন। পিকলু এখন চারদিকে তাকাচ্ছে।

রেস্তরাঁর টেবিলগুলো বেশ গায়ে-গায়ে লাগানো। পাশের টেবিলেও দুজন লোক বসে আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন ইণ্ডিয়ান হলেও হতে পারেন; আর-একজন কোন দেশের তা পিকলু ঠিক বুঝতে পারলো না। বিরাট দশাসই চেহারা। গোঁফটাও লেটেস্ট স্টাইলের। মাথা ভরতি কোঁকড়া চুল। কিন্তু ঠিক যেন জঙ্গল—কোনোদিন ওর মধ্যে বোধহয় চিরুনি ঢোকে না।

হরিময়বাবু এবার লজ্জায় জিভ বার করে ফেললেন। পিকলুকে বললেন, "আমি খুবই দুঃখিত। বাড়ি ফিরেই দেখি ভাইপো রামুর এক্‌সপ্রেস টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম দেখে তো আমার বিশ্বাসই হয় না। আমি তো ভেবেছিলুম রামুর সঙ্গে আমার কোনোদিন দেখাই হবে না। কিন্তু সেই ভাইপো রামু চমচমের টেলিগ্রাফিক নম্বরে তার করেছে সে কলকাতার ওপর দিয়ে চলে যাবে। যদি ইচ্ছে থাকে, তাহলে যেন একবার দমদমে দেখা করতে আসি।"

রামানুজ চৌধুরীর দাঁতগুলো ঠিক ঝকঝকে মুক্তোর মতো। আর চেহারাটা কালো হলেও ঝকমকে। শরীরটায় বেশ জেল্লা আছে। হরিময়বাবুর শরীরের সঙ্গে ভাইপোর কিন্তু কোনো মিল নেই। হরিময়বাবু বেঁটে, ভাইপো লম্বা। হরিময়ের নাকখানা রিভলবারের নলের মতো, ভাইপোর নাকটা চাপা।

ঠাণ্ডা বোতল শেষ করে পুরানো বন্ধু ললিতবাবুর সঙ্গে গল্প করবার জন্যে হুকুম সিং উঠে পড়লো।

রামানুজ এতোক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার জিজ্ঞেস করলেন, "এঁরা কারা?"

হরিময়বাবু ভাইপোর কাছে কিছুই চাপলেন না। প্লেন ড্রেসে এরা যে পুলিসের লোক এবং পিকলুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন সব বলে দিলেন।

পিকলুর মনে হলো পাশের টেবিলের লোকরাও ওদের কথাবার্তা খুব মন দিয়ে শুনছেন। এবার হাসি-হাসি মুখ করে ওঁরাও টেবিলের কাছে সরে এলেন।

রামানুজবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, "মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার—আমার ফ্রেণ্ড এবং একই হাওয়াই জাহাজে হংকং থেকে কলকাতায়

এসেছেন। আর ইনিই মিস্টার পিক্‌ল।"

"পিক্‌ল নয়—পিক্‌ল মানে তো আচার। ইনি হচ্ছেন পিকলু," সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন হরিময়বাবু। নামের বিকৃতি উনি একদম সহ্য করতে পারেন না।

এঁরা দুজনেই যে সবে ফরেন থেকে নেমেছেন তা এঁদের জামা-কাপড় এবং মালপত্তর দেখলেই বোঝা যায়।

ভাইপো-গর্বে গর্বিত হরিময়বাবু খুব খুশী হয়ে বললেন, "ফরেনের ব্যাপারই আলাদা। রামু, তোর গা দিয়ে যে সেন্টের গন্ধখানা বেরুচ্ছে না!"

পিকলু লজ্জা পাচ্ছে। দুজন অতিথি বাংলা কথা বুঝতে পারছেন না। ইংরিজীতে কথা বলাটাই এই অবস্থায় ভদ্রতা।

কিন্তু হরিময়বাবু বাংলায় বললেন, "মাইডিয়ার ভাইপোকে আমি কতদিন পরে ফেরত পেয়েছি। এখন দুটো প্রাণের কথা বলে বুক হাল্কা করতে চাই—ইংরিজীর প্রশ্নই ওঠে না। মিস্টার সিঙ্গারাভেলুর জেঠু যদি এখানে আসতেন তাহলে নিশ্চয় ওঁরা ম্যাড্রাসি ভাষায় কথা বলতেন।"

ইস্‌! বেশ লজ্জা করছে পিকলুর। হরিময়বাবুর জানা উচিত ম্যাড্রাসি বলে কোনো ভাষা নেই। ভদ্রলোকের মাতৃভাষা নি চয় তামিল।

"মাত্র ফরটি-এইট আওয়ারস"—অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে হরিময়বাবুর ভাইপো কলকা ায় এসেছেন। স্রেফ ব্রেক জার্নি। হংকং থেকে জেনিভার পথে কলকাতায়।

পিকলু অবাক হয়ে রামানুজবাবুর জিনিসপত্তর লক্ষ্য করছে। ওঁর গলা থেকে, কাঁধ থেকে, কোমরের বেল্ট থেকে কতরকম অজানা

জিনিস যে ঝুলছে। অনেকদিন আগে ইলেকট্রিক ট্রেনে পিকলু এরকম এক ফেরিওয়ালা দেখেছিল। তারও চোখে রঙিন চশমা। সেই লোকটার সমস্ত দেহ থেকে মেডেলের মতো নানা রংয়ের প্লাস্টিকের চিরুনি, জুতোর বুরুশ, ছুরি, পেন, চামচে, চশমা ঝুলছিল।

রামানুজ ফস করে চোখের চশমাটা খুলে পিকলুর দিকে এগিয়ে দিলেন। "পরে দেখো। স্পেশাল পোলারয়েড-লেন্স—নিউইয়র্কে সবে বেরিয়েছে।"

চশমাটা পরবার লোভ সামলাতে পারলো না পিকলু। আঃ, চোখ দুটো কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেলো—ঠিক যেন চোখ দিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে।

মিস্টার আয়ারের সর্বাঙ্গেও নানারকম অজানা যন্ত্রপাতি ঝুলছে। একটা যন্ত্র খুলে হঠাৎ তিনি নিজের গালের ওপর বুলোতে লাগলেন। হরিময়বাবু ফিসফিস করে বললেন, "ব্যাটারি-চালিত অটোমেটিক দাড়িকামানোর কল। উঃ। সাবান নয়, জল নয়, ব্লেড নয়—স্রেফ ম্যাজিকের মতো কামানো হয়ে গেলো। সম্রাট শাজাহানও এই সুখ ভোগ করতে পারেননি। পিকলু, তোমার দাড়ি গজালে ওইরকম একটা মেশিন যোগাড় করে ফেলো। আমার মতো খোঁচা-দাড়ির খোঁচা তোমাকে খেতে হবে না।"

জেঠুর কথা শুনে রামানুজ বললো, "মোস্ট অর্ডিনারি ফিলিশেভ। মিস্টার আয়ারকে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াতে হয়, আমিরী কায়দায় দাড়ি কামাবার সময় কোথায়?"

অন্যসব যন্ত্রগুলোও আড়চোখে দেখছেন হরিময়বাবু। টেপরেকর্ডার, টেলিফটো লেন্স, ট্রানজিস্টর রেডিও, কতরকমের ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশ যে রয়েছে। এসব তিনি জীবনে দেখেননি।

হরিময়বাবুর মনে পড়ছে অতীতের কথা। এই রামুর একজোড়া চটির বেশি ছিল না। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় একখানা ফাউনটেন পেনের জন্যে কী কান্নাকাটি করেছিল রামু। তারপর পাস-টাস করে রামু অনেক দিন বেকার বসেছিল। একটা স্টেশনারি দোকানে শেষ পর্যন্ত কী একটা চাকরি জুটিয়েছিল। কিন্তু থাকা খাওয়ার খরচ উঠতো না।

শেষ পর্যন্ত, হঠাৎ একদিন রামু উধাও হলো। কোথায় গেলো, কী হলো, প্রথমে জানাই যায়নি। তারপর রামু বিদেশ থেকে একখানা রঙিন ছবির পোস্টকার্ড পাঠালো। হরিময়বাবু ছবিখানা আজও যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছেন। আন্দাজ করেছেন তাঁর ভাইপো এখন বিদেশে কেষ্ট-বিষ্টু হয়েছে।

পুরানো দিনের কথা ভেবে হরিময়বাবুর চোখে জল এসে যাচ্ছে। কিন্তু এখন কাঁদবার সময় নয়। ভাইপোটিকে নিয়ে তিনি বাড়ি যেতে চান।

মালপত্তর নিয়ে ওঁরা এয়ারপোর্টের গেটের কাছে এসে ট্যাক্সির জন্যে লাইন দিলেন। বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজব শেষ করে হুকুম সিংও ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে।

কোঁকড়া-চুলওলা এক মেমসায়েব তাঁর মাল নিয়ে একটা ট্যাক্সি চড়ে ভোঁ করে বেরিয়ে গেলেন। পরের ট্যাক্সিতে মিস্টার আয়ার তাব মালপত্তর তুলে ফেললেন। লম্বা-চওড়া চুল না-আঁচড়ানো সায়েবটি দূরে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, তখন মিস্টার আয়ার চিৎকার করে উঠলেন, "মিস্টার চৌধুরী, আসুন। আপনিও তো

কর্নওয়ালিস হোটেলে উঠছেন।"

হা-হা করে উঠলেন হরিময়বাবু। "আমার ভাইপো হুদিনের জন্যে কলকাতায় এসে কেন হোটেলে উঠবে? চমচম আপিসে হুজনের বেশ জায়গা হয়ে যাবে।"

মিস্টার আয়ার ততক্ষণে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছেন। কিন্তু কোথায় রামানুজ চৌধুরী? তিনি তখন একটু দূরে পিকলুকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, "এখানে ছবি তোলা যায় তো?"

আজকাল সব জায়গায় ছবি তোলার পারমিশান থাকে না। ক্যামেরা বার করলেই পুলিসের খপ্পরে পড়তে হবে। পিকলুবাবুর ছবি তোলা হচ্ছে দেখে হুকুম সিং বাধা দিলো না। বরং বললো, "জলদি খোকাবাবুর ছবি তুলে নিন।"

রামানুজ চৌধুরী যখন ছবির ফোকাশ ঠিক করছেন তখন মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার ও হরিময়বাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন।

মিস্টার আয়ার জিজ্ঞেস করলেন, "কী ঠিক করলেন? হোটেলই তো ভাল ছিল। ঠিক আছে—সারাদিন জেঠুর কাছে থাকুন—রাত্রে হোটেলে চলে আসুন।"

হরিময়বাবুকে বুঝিয়ে রামানুজ বললেন, "আমরা লে-ওভার পাবো এরোপ্লেন কোম্পানি থেকে। কর্নওয়ালিস হোটেলে আমার ও মিস্টার আয়ারের জন্যে ঘর ঠিক আছে।"

লে-অফ কথাটা হরিময়বাবু শুনেছেন। লে-অফের ধাক্কায় কারখানার লোক বাড়িতে বেকার বসে থাকে, খুব কষ্ট পায়। তিনি ভাবলেন, এরোপ্লেন কোম্পানিতে হয়তো কোনো গোলমাল হয়েছে।

ভাইপো এবার হেসে বললো, "জেঠু, লে-অফ নয়—লে-ওভার। মানে, জামাই আদর—প্লেন কোম্পানির খরচে আমরা হোটেলে

থাকবো। পকেট থেকে একটি আধলা খরচ হবে না। এমন কী, এই এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে যাবার ট্যাক্সি ভাড়াও ওদের।"

শেষ পর্যন্ত রামানুজ বললো, "মিস্টার আয়ার, আপনি এগোন। আমি জেঠুর বাড়িতে একবার দেখা দিয়েই কনওয়ালিস হোটেলে যাচ্ছি।"

আয়ারের ট্যাক্সি এবার তীরের বেগে এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। শুধু মিস্টার রামানুজ চৌধুরীর জিনিসপত্র রাস্তায় পড়ে রইলো।

হরিময়বাবু হন্তদন্ত হয়ে ভাইপোকে বকুনি লাগালেন, "দামী জিসিসপত্তর এভাবে ছড়িয়ে রাখিস না, রামু। এর নাম কলকাতা শহর।"

আড়চোখে একবার সব ক'টা জিনিসের হিসেব মিলিয়ে নিলো রামানুজ। তারপর একটা ক্যামেরা তুলে নিয়ে পিকলুর কাছে চলে এলো।

পিকলু তখনও গেটের কাছে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবি তোলার কথা শুনলেই ও কী রকম শক্ত হয়ে যায়। অথচ ছবি তোলাতে ওর খুব ভাল লাগে।

নিজের বক্স ক্যামেরায় সে ইতিমধ্যে এয়ারপোর্টের একটা ছবি তুলে নিয়েছে। হরিময়বাবুকে যে-রকম দেখাবে ওই ছবিতে ভেবে সে বেশ মজা পাচ্ছে।

হরিময়বাবু দেখতেও পাননি যে, পিকলু ছবি তুলে নিয়েছে—তবে মিস্টার আয়ার এবং ওই বিরাট লোকটা আড়চোখে ফটোগ্রাফার পিকলুকে ছবি তুলতে দেখে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলো। পিকলুর মনে হলো, বিরাট লম্বা চওড়া ওই সায়েব পিকলুকে দিয়ে ছবি তোলানো

পছন্দ করলেন না। পিকলু শুনেছে, বিনা অনুমতিতে ছবি তুললে অনেকে বেশ বিরক্ত হন।

রামানুজ এবার পটাপট পিকলুর ছবি তুলে ফেললো, এবং দশাসই ওই সায়েব হঠাৎ এগিয়ে এসে মুখ টিপে হাসতে-হাসতে ওদের সকলের গায়ে সুগন্ধ সেণ্ট স্প্রে করে দিলো। সেণ্টের গন্ধে মাতোয়ারা হরিময়-বাবু খুব খুশী হয়ে বললেন, "আমাদের জন্যে ভদ্রলোক কতখানি সেণ্ট নষ্ট করলেন দ্যাখো। হয়তো ওঁদের দেশে এইরকম সেণ্ট ছড়িয়ে বন্ধুত্ব পাতাতে হয়।"

ইতিমধ্যে আর-একখানা খালি ট্যাক্সি এসে থামলো। এবং হরিময়বাবুর নির্দেশে পোর্টার সেই গাড়িতে রামানুজের জিনিসপত্তর তুলতে লাগলো।
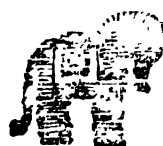
ভবনাথ সেন আরাম কেদারায় বসে গড়াগড়া টানছেন। ঘড়িতে পৌনে আটটা বাজলো। পিকলুর ঠাকুমা এর মধ্যে দু'বার ঘড়ি দেখে গেলেন—কারুর জন্যে চিন্তা থাকলে তিনি ঘন-ঘন দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকান।

ভবনাথ বললেন, "পিকলুর জন্যে কোনো চিন্তা নেই—সঙ্গে হুকুম সিং এবং হরিময়বাবু রয়েছেন।"

এমন সময় হৈ-হৈ করে ওরা তিনজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। খুশিতে টগবগ করতে করতে হরিময়বাবু ছোটছেলের মতো বললেন, "দুর্দান্ত। ভাবা যায় না।"

পিকলু ভড়াং করে একটা সোফার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর বললো, "উঃ, আজ সমস্ত দিন কলকাতায় ঘুরে-ঘুরে যা হৈ-চৈ হয়েছে না।"

হরিময়বাবু বললেন, "আপনার নাতি ইচ্ছে করলেই একখানা বই লিখে ফেলতে পারে—'পিকপুর কলকাতা ভ্রমণ—প্রথম পর্ব'।"

প্রথম পর্ব এই কারণে, কাল নাকি আবার দ্বিতীয় পর্ব ভ্রমণ হবে। হরিময়বাবু এবার পিকলুর ঠাকুমাকে অনুরোধ করলেন, "আপনার বেয়াইকে একটু বলে দিন, আগামীকালও হুকুম সিংকে আমাদের দলে চাই। হুকুম সিং সশরীরে উপস্থিত থাকলে আমাদের কোনো

চিন্তাই থাকে না।"

ঠাকুমা বললেন, "বসুন, কিছু খান।"

হরিময়বাবু বললেন, "বসবার উপায় নেই—সর্দিতে নাকটা বুজে আছে।"

ভবনাথ একটু অবাক হলেন। কারণ হরিময়বাবু গর্ব করতেন, তিনি সর্দিকাশিতে ভোগেন না।

রুমালে কয়েকবার নাক পরিষ্কারের ব্যর্থ চেষ্টা করলেন হরিময়। তারপর বললেন, "হঠাৎ কী যে হলো—এখনই ওষুধের দোকানে যেতে হবে।"

ঠাকুমা বললেন, "আমাদের বাড়িতেই নাকের ড্রপ এবং ইনহেলার রয়েছে।"

ইনহেলার ব্যাপারটা হরিময়বাবুর কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়। বললেন, "ওই নাকের মধ্যে ফাউনটেন পেন গুঁজে দেবার মতো জিনিসটা? আমি কখনো ব্যবহার করিনি—জিনিসটা দেখলেই কেমন আমার হাসি লাগে। দিন, এখন যখন অসুবিধায় পড়েছি—যে-রোগের যে চিকিৎসা!"

হরিময়বাবু যখন নাকে ওষুধ নিচ্ছেন, তখন ভবনাথ লক্ষ্য করলেন হুকুম সিংও সর্দিতে হাঁসফাঁস করছে।

হুকুম সিংয়ের নাকেও কয়েক ফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিলেন ঠাকুমা। সঙ্গে-সঙ্গে এমন জোরে হাঁচলো হুকুম সিং, বাড়িটা যেন কেঁপে উঠলো।

ভবনাথ লক্ষ্য করলেন, যার প্রায় সব সময় সর্দি লেগে থাকে, সেই পিকলুর কিন্তু কিছু হয়নি। ব্যাপারটা তাঁর কাছে একটু আশ্চর্যই লাগলো।

নাক টানতে-টানতে হরিময়বাবু বললেন, "আজ যা মজা হয়েছে

না। শ্যামবাজারের মোড়ে একটা বিরাট পোস্টার দেখে আমার ভাইপো তো তাজ্জব। লেখা আছে: 'খারাপ লোকের খপ্পরে পড়ুন।' সে বেচারা তো রীতিমতো নার্ভাস হয়ে গেলো। বললে, 'ওয়ার্লডের কোনো শহরে এই ভাবে জনসাধারণকে খারাপ লোকের খপ্পরে পড়বার জন্যে অনুরোধ করা হয় না।'"

"তারপর?" মৃদু হেসে ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"তখন বাধ্য হয়ে ভাইপোর কাছে টপ সিক্রেট ফাঁস করলুম। চমচমের বিশেষ সংখ্যায় স্পেশাল উপন্যাসের নাম 'খারাপ লোকের খপ্পরে'—সেইটাই জনসাধারণকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভবনাথ সেন এবার হা-হা করে হেসে ফেললেন। হরিময়বাবু বললেন, "দাঁড়ান—এখনও হাসির বাকি আছে। আমার ভাইপোর ফ্রেণ্ড মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার—কোনো একসময় বোধহয় ঢাকাতে ছিলেন। রীতিমতো বাঙলা জানেন। আমাদের সেকেণ্ড পোস্টারখানা দেখে ভদ্রলোক বেশ ঘাবড়ে গেলেন। ধর্মতলা স্ট্রীটে পরের পর, ল্যাম্পপোস্টে পাবলিসিটি হয়েছে: 'খারাপ লোকের খপ্পরে পড়েছেন? এখনই খোঁজ করুন।' পিকলুটা আবার বোকার মতো বলে ফেলেছে, পুলিস থেকে বিজ্ঞাপন দিয়েছে বোধহয়। জানতে চাইছে, সত্যিই কেউ খারাপ লোকের খপ্পরে পড়েছে কিনা।"

পিকলু হাসতে-হাসতে বললো, "জানো দাদু, মিস্টার সিঙ্গারা-ভেলুর মুখ শুকনো হয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলেন, এখানকার পুলিস খুব সজাগ বুঝি?"

হরিময়বাবু বললেন, "বিদেশীর কাছে স্বদেশী পুলিসের বদনাম আমার সহ্য হয় না। সঙ্গে-সঙ্গে শুনিয়ে দিলাম, পুলিস জানে 'শত্রু নিকটেই আছে।' ভাগ্যে চাইনীজ যুদ্ধের সময় যে-পোস্টারখানা

চমচমে ছাপিয়েছিলাম, তার ওয়ার্ডিংগুলো মনে ছিল।"

হরিময়বাবু নাকে আর একবার সর্দির ওষুধ গুঁজলেন। কিন্তু জানালেন, "নাকটা ক্রমশই বুজে আসছে। কোনোরকমে নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি।"

আর গল্পগুজব নয়। হরিময়বাবু ও হুকুম সিং এবার উঠে পড়লেন।

রাতের খাবার খেতে বসে পিকলু বললো, "দাদু অবাক কাণ্ড।"

অবাক হবার কাণ্ডই বটে। পকেট থেকে একখানা রঙিন ফটো বার করলো পিকলু। এ যে পিকলুরই ফটো—এয়ারপোর্টের সামনে বুক ফুলিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে পিকলু। ছবি দেখে ঠাকুমা খুব খুশী হলেন।

পিকলু বললো, "হরিময়দাদুর ভাইপো ম্যাজিক দেখিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন, হাসো! আমি হাসলাম, উনি ক্যামেরার বোতাম টিপলেন। তারপর ওয়ান-টু-থ্রি এইভাবে কুড়ি পর্যন্ত গুনলেন।" এবার ক্যামেরার ভিতর থেকে পিকলুর এই রঙিন ছবিটা বেরিয়ে এলো। তাজ্জব ব্যাপার।

পিকলু নিজেও ছবি তোলে বক্স ক্যামেরায়। ছবি তোলা হলে ফিল্মটা স্টুডিওতে পাঠিয়ে দেয়, সেখানে নেগেটিভ ওয়াশ হয়। ডেভেলপ করা নেগেটিভ থেকে এক-একখানা পজিটিভ ছবি অন্য একটা কাগজে ডার্করুমে ছাপা হয়। কত সময় লাগে। কিন্তু রামানুজ-কাকুর আশ্চর্য যন্তর—বোতাম টেপামাত্রই হাতে-হাতে ছবি।

রুটি চিবোতে-চিবোতে ভবনাথ বললেন, "পড়েছি বটে। এর নাম পোলারয়েড ইন্‌স্ট্যান্ট ক্যামেরা। কখনও দেখিনি। গোড়ার দিকে শুধু সাদা-কালো ছবি উঠতো, এখন তাহলে রঙিন ছবি তুলবার

ক্যামেরাও হয়েছে।" ভবনাথ মনে-মনে ইংরেজী ইন্‌স্ট্যান্টামেটিকের একটা বাংলা নাম ঠিক করে নিলেন: তাৎক্ষণিক ক্যামেরা।

ক্যামেরা থেকে সোজাসুজি রঙিন ছবি বেরিয়ে আসতে দেখেই কেবল পিকলু অবাক হয়নি। আরও একটা ভূতুড়ে ব্যাপার হয়েছে। ছবিখানা যেমনি রামানুজবাবু পিকলুর হাতে দিলেন অমনি হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো, আজ সকালে স্নান করা হয়নি। পিকলু বললো, "জানো দাতু, ছবিটায় যেন কেমন ঘেমো-ঘেমো গন্ধ পেলাম।"

হা-হা করে হেসে উঠলেন ভবনাথ। "ছবিতে তোর গায়ের ঘেমো গন্ধ ধরা পড়লো বলছিস?"

পিকলু জানালো হরিময়দাতু এবং হুকুম সিংকেও ছবিটা সে চুপি-চুপি দেখিয়েছিল। কিন্তু দারুণ সর্দিতে ওঁদের নাক বুজে গিয়েছে—কোনো গন্ধই ওঁরা পেলেন না। কিন্তু হরিময়বাবু কিছুতেই স্বীকার করবেন না যে, তাঁর নাক দিয়ে গন্ধ ঢুকছে না।

ছবিটা বার করে পিকলু এবার ভবনাথের হাতে দিলেন। সত্যি ভৌতিক ব্যাপার। তিনিও যেন ঘেমো গন্ধ পাচ্ছেন। ঠাকুমা বললেন, "যত তোদের সব পাগলামি। সারাদিন তোর পকেটে-পকেটে ছবিটা ঘুরছে—তাই তোর ওইরকম মনে হচ্ছে।"

ঠাকুমা ভিতরে চলে গেলেন, কিন্তু পিকলুর সন্দেহ কমলো না। ছবিটা সে আবার শুঁকে দেখলো। তারপর দাতুকে বললো, "তুমি আমার হাফ্-প্যান্টের ডান পকেটের দিকটা শুঁকে ত্যাখো—পেয়ারার গন্ধ পাচ্ছ না?"

ছবিতে যেখানে পকেট দেখা যাচ্ছে সেখানে নাক নিয়ে গিয়ে পাকা পেয়ারার কড়া গন্ধ পেলেন ভবনাথ। পিকলু বললো, "আমার ডান পকেটে একটা পেয়ারা ছিল। অথচ বাঁ পকেট শুঁকলাম,

কোনো গন্ধ নেই।”

ব্যাপারটা সত্যিই একটু ভূতুড়ে মনে হচ্ছে ভবনাথের। কিন্তু ভূত-পেত্নীতে পিকলুর অত বিশ্বাস নেই। সে বললে, “ভূতুড়ে নয়···রহস্যাবৃত!” শেষ কথাটা ভবনাথ তাঁর গল্পে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।

ভবনাথ এরপর পিকলুকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায়-কোথায় গিয়েছিলি তোরা?”

পিকলু হুড়হুড় করে সব বলে গেলো। এয়ারপোর্টে হরিময়বাবুর ভাইপো রামানুজকাকু ছাড়াও ওঁর বন্ধু মিঃ আয়ারের সঙ্গে আলাপ হলো। সঙ্গে আরও একজন লম্বা-চওড়া বিদেশী ছিলেন—কোন দেশের লোক পিকলু ঠিক বুঝতে পারেনি। হয়তো মিশ্র জাতেরও হতে পারেন। দেখলে মনে হয় কুস্তিগীর। হুকুম সিংয়ের সঙ্গে আলাপ করেও ওঁরা খুশী। হুকুম সিং না থাকলে সাহস করে এয়ারপোর্টে কেউ পিকলুর ছবি তুলতেই পারতো না। তারপর চমচম অফিস ঘুরে রামানুজবাবুরা নিউ মার্কেটের পিছনে কর্নওয়ালিস হোটেলে উঠলেন।

হরিময়বাবু ভাইপোকে খুব রিকোয়েস্ট করেছিলেন চমচম আপিসে ওঠবার জন্যে। রামানুজ রাজী হয়েও ছিলেন, “কিন্তু ওই মিঃ সিঙ্গারাভেলুর চাপে পড়ে রামুকাকু হোটেলেই হাজির হলেন।”

“খুব পুরনো বন্ধু হয়তো হবেন,” পিকলুর বর্ণনা শুনতে শুনতে ভবনাথ মন্তব্য করলেন।

পিকলু বললো, “মোটেই না। হংকং এয়ারপোর্টে আলাপ। দুজনেই খুব গল্প করতে ভালবাসেন।”

ওখানে চা-টা খেয়ে কলকাতা ঘুরে বেড়াবার প্ল্যান হলো।

পিকলু বললো, “জানো দাদু, ওঁদের কাছে কত রকমের অদ্ভুত জিনিসপত্তর। ওই লম্বা সায়েবের কাছে একখানা সেণ্ট যা আছে

না। এয়ারপোর্টে সরু লম্বা একটা শিশি বার করে আঙুলের একটু চাপ দিতেই স্প্রে হয়ে গেলো হরিময়দাহু এবং হুকুম সিংয়ের ওপর। বিলিতী সেন্টের সেই গন্ধে হরিময়দাহুর খুব আনন্দ—স্বদেশী আন্দোলনের পর এই প্রথম সেন্ট মাখলেন হরিময়দাহু।"

"সেই সায়েবটা তোদের সঙ্গে কথা বলেছিল?" ভবনাথ জানতে চান।

"মোটেই না। সায়েব হয়তো ইংরিজী বোঝেন না। তবে আমাদের দেখলেই হেসেছেন—আমরাও হাসিমুখ দেখিয়েছি। ওঁর সঙ্গে রামানুজকাকু বা মিস্টার সিঙ্গারাভেলুর কোনো সম্পর্ক নেই। একই প্লেনে হংকং থেকে এসেছেন এই পর্যন্ত। এবং একই হোটেলে উঠেছেন অ্যাক্সিডেনটালি।"

পিকলু বলে চললো, "হরিময়দাহুর ভাইপোর গপ্পো শুনলে তুমি খুব হাসবে, দাহু। রামানুজকাকু নাকি পড়াশোনায় খুব খারাপ ছিলেন। ছবি তোলার খুব লোভ ছিল। আর…" এবার পিকলু আর হাসি চাপতে পারলো না।

দাহু ওর মুখের দিকে তাকালেন। পিকলু বললো, "খু-উব পেটুক ছিলেন। চপ কাটলেট চানাচুর থেকে আরম্ভ করে দই সন্দেশ রসগোল্লা পর্যন্ত সব কিছু খাবার খেতে প্রচণ্ড ভালবাসতেন। দু-একবার হরিময়দাহুর পকেট থেকে পয়সা চুরিও হয়েছে—প্রতিবারেই হরিময়দাহু মিষ্টির দোকানের খালি বাক্স ওয়েস্ট পেপার বাক্সে পড়ে থাকতে দেখেছেন। কিন্তু প্রমাণের অভাবে হরিময়দাহু কখনও কিছু বলতে পারেননি।"

পিকলু বললো, "তারপর কিন্তু রামুকাকুকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হলো। রাবড়িচূর্ণ চুরি করে ধরা পড়বার ভয়ে।"

হরিময়বাবুর যে রাবড়িচূর্ণের নেশা আছে তা ভবনাথ জানেন। অন্য লোকেরা বিড়ি, সিগারেট, নস্যি, খৈনির নেশা করে। কিন্তু হরিময়বাবুর স্পেশাল নেশা, বোধহয় ওয়ার্লডে কারও নেই। ট্রামে-বাসে, রাস্তায় যেতে-যেতে মাঝে-মাঝে খৈনির মতো মুখে একটু রাবড়িচূর্ণ না ফেললে হরিময়বাবুর মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে। নেশাটা বেশ চেপে বসেছে। রাবড়িচূর্ণ মানে হরলিক্‌সের গুঁড়ো।

রামুকাকু একদিন দুপুরে হরিময়বাবুর ঘরে ঢুকে পুরো এক শিশি রাবড়িচূর্ণ সাবাড় করে ফেলেছিলেন। তারপর ভয় পেয়ে সেই যে গৃহত্যাগ করেছিলেন—আর কেউ খোঁজ পায়নি। কীভাবে ফরেনে পালিয়েছিলেন রামানুজকাকু সেটাই নাকি একটা গপ্পো। তবে ওখানে খুব নাম করেছেন রামানুজকাকু, রেডিওতে মস্ত কী এক চাকরি করেন। সেই কাজেই তেহারান এবং জেনিভা যাবার পথে কিছু-ক্ষণের জন্যে কলকাতায় নেমে পড়েছেন।

হংকং-এ মিস্টার সিঙ্গারাভেলুর সঙ্গে খুব আলাপ হলো। উনি বললেন, "তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতা ঘুরে আসি।"

"হরিময়দাদু ভাইপোকে কী উপহার দিলেন জানো? এক শিশি রাবড়িচূর্ণ। বললেন, সামান্য এক শিশি চূর্ণর জন্যে তুই সংসার ত্যাগ করলি। খুব হাসলেন রামুকাকু—তিনি এখন ওসব জিনিস খান না।"

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর তোরা কোথায় গেলি?"

পিকলু মুখে একটা জাপানী লজেন্স পুরে বললো, "কর্নওয়ালিস হোটেলে চা টোস্ট খেয়ে আমরা পাঁচজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।"

পাঁচজন লোককে আজকাল একখানা ট্যাক্সিতে নিতে চায় না। কিন্তু হুকুম সিং থাকায় কোনো অসুবিধে হলো না। একজন ট্যাক্সিওয়ালা বেশি ভাড়া চাইতে গিয়ে হুকুম সিংকে দেখে লজ্জায়

জিভ কাটলো। ক্ষমা চেয়ে বললে, "স্লিপ অফ টাং, আর কখনও সে বেশি ভাড়া চাইবে না।

এরপর ভবনাথ ভেবেছিলেন এরা আবার কলকাতার বিখ্যাত জায়গাগুলো, যেমন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, মিউজিয়ম, এই সব দেখবেন।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। ওঁরা প্রথমে গেলেন হ্যারিসন রোডের ওপর বিখ্যাত এক চপ-কাটলেটের দোকানে। দিলখুশা রেস্তর াঁর গন্ধ নাকি রামুকাকুর নাকে এতো বছর পরেও লেগে আছে। ওখানকার চিকেন কবিরাজী কাটলেট নাকি ওয়ার্লডস বেস্ট। দুশো গজ দূর থেকে ভুরভুর করে গন্ধ ছাড়ে। গন্ধ শুঁকে দোকান খুঁজে পাওয়া গেলো। ওর সামনে দাঁড়িয়ে রামুকাকু একটা ছবি তোলালেন। বোতাম টিপলেন মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার।

এরপর বিখ্যাত এক কচুরি-সিঙাড়ার দোকান। সেখানের খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ প্রাণ মাতিয়ে দিচ্ছে। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে সেই পবিত্র গন্ধ নিশ্বাস নিলেন হরিময়বাবুর ভাইপো। ওখানেও ছবি উঠলো।

ট্যাক্সি এবার ছুটে চললো এসপ্লানেডের কাছে সেই বিখ্যাত মোগলাই পরোটার দোকানের দিকে। অনাদির দোকানেও গন্ধ ভুরভুর করছে। রামুকাকু বললেন, "এমন গন্ধ কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।" মোগলাই পরোটা ও কষা মাংস খেতে-খেতে ছবি তোলার প্রস্তাব উঠলো। এ-অবস্থায় ছবি তুলতে আপত্তি উঠছিল—অনেক ভদ্রলোক মহিলাদের নিয়ে মোগলাই পরোটা ও কষা মাংস খাচ্ছেন। এ-অবস্থায় ছবি ওঠাতে অবশ্যই আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু হুকুম সিং সঙ্গে থাকায় কেউ

আর প্রতিবাদ করলো না। রামুকাকু মনের সুখে ছবি তুললেন।

ট্যাক্সিতে চড়ে বড়বাজার সত্যনারায়ণ পার্কের দিকে যেতে-যেতে রামুকাকু বললেন, "এইসব দোকান হলো কলকাতার অমূল্য-সম্পদ। এক-আধখানা ঐতিহাসিক মনুমেণ্ট থাকলো আর না থাকলো, কিন্তু ভীমনাগ, গাঙ্গুরাম, পুঁটিরাম, তেওয়ারি, গুপ্ত, শর্মা ছাড়া কলকাতা শহর কল্পনাই করা যায় না।"

হরিময়বাবু উৎসাহ পেয়ে বললেন, "নোনতার দিকটাই বা বাদ দিচ্ছ কেন—নানকিং, নিজাম, চাংওয়া, চাচা, রয়াল। আস্বাদের দিকেই বলো আর গন্ধের দিকেই বলো প্রত্যেকটি দোকানের এক একটি বৈশিষ্ট্য। চোখ বেঁধে দিলেও স্রেফ গন্ধ শুঁকে হাজার হাজার লোক বলে দেবে কোন দোকানে নিয়ে এসেছো।"

মিস্টার আয়ার এই সময় বলে ফেলেছিলেন, "দুর্গন্ধের শহর বলেই লোকে কলকাতাকে জানে—কিন্তু এমন সুগন্ধ পৃথিবীর আর কোথায় আছে ?"

বড়বাজারে তেওয়ারির দোকানে তখন শোনপাঁপড়ি বিক্রি হচ্ছে। ভিড় ঠেলে সেখানে ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু হুকুম সিংয়ের ভয়ে ট্যাক্সিওয়ালা অসাধ্য সাধন করলো। শোনপাঁপড়ি খেতে-খেতে ওখানেও ছবি তোলা হলো। তারপর চিৎপুরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি এবং নেপাল হালুইকরের দোকানের মধ্যে ওঁরা নেপালের দোকানই নির্বাচন করলেন।

হরিময়বাবু পিকলুকে বললেন, "ভাবছি, ভাইপোকে একটা অনুরোধ করবো। চমচমের স্পেশাল সংখ্যার জন্যে কলকাতার একটা স্পেশাল খাদ্য-ম্যাপ করে দিতে—কোথায় কোন রাস্তায় কী বিখ্যাত খাবারের দোকান আছে শুধু তাই দেখানো থাকবে।"

উৎসাহের সঙ্গে হরিময়বাবু বলেছিলেন, “ভাবা যায় না, কী হবে। প্রকাশের পনেরো মিনিটের মধ্যে সমস্ত চমচম যদি নিঃশেষিত না হয় তা হলে পত্রিকা সম্পাদনা ছেড়ে দেবো।”

সারাদিন ঘুরে-ঘুরে পিকলুর ঘুম পাচ্ছে। বাকি গল্প পরের দিন শোনা যাবে। পিকলু নিজের ঘরে যাবার আগে গম্ভীর হয়ে গেলো। বললো, “দাদু, সমস্ত ছবিই তো এই তাৎক্ষণিক ক্যামেরার তোলা। কী সুন্দর রঙিন সব ছবি। কিন্তু…”

“কিন্তু কেন ? বলেই ফেলো,” ভবনাথ নাতিকে সাহস দিলেন।

পিকলু বললো, “চাংওয়ার ছবিটি আমি একবার হাতে নিয়েছিলাম। আমার মনে হলো, ছবিটার গা থেকে ভুরভুর করে চিকেন ফ্রায়েড রাইসের গন্ধ ছাড়ছে।”

“হুকুম সিং বা হরিময়বাবু লক্ষ্য করেননি ?”

“ওঁরা করবেন কোথা থেকে ? ওঁরা তো সর্দিতে হাঁসফাঁস করছেন।”

পিকলু ঘরে চলে যাচ্ছিলো। এমন সময় ভবনাথ ডাকলেন, “পিকলু।”

পিকলু দাদুর কাছে ফিরে এলো। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, “তোদের দলে কার-কার সর্দি হয়েছে ?”

দাদুর প্রশ্নে পিকলু হেসে ফেললো। ঠাকুমা বললেন, “তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?”

পিকলু হিসেব করে বললো, “আমি এবং মিস্টার আয়ার ছাড়া সবার। এমন কী রামুকাকুরও।”

দাদু বললেন, “এই সিঙ্গারাভেলুর কোনো বিশেষত্ব তোর নজরে পড়েছে ?”

পিকলু হেসে ফেললো। বললো, "নাকে এবং কানে অজস্র চুল। ঠিক যেন বন হয়ে আছে।"

ঠাকুমা বললেন, "ছিঃ, পিকলু, লোকের শরীর নিয়ে ও-ধরনের কথাবার্তা বলতে নেই। ভগবান যাকে যা দিয়েছেন।"

পিকলুকে নিয়ে ওর ঠাকুমা ঘুমোতে চলে গেলেন। কিন্তু ভবনাথের চোখে ঘুম নেই। গল্পের প্লট এখনও দানা বাঁধেনি। ইতিমধ্যে নতুন উপসর্গ জুটেছে। পিকলুর প্রথম কলকাতা ভ্রমণের ছবিগুলো ওঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

আলো নিভিয়ে চোখ বন্ধ করলেন ভবনাথ—কিন্তু গন্ধ আর সর্দি, সর্দি আর গন্ধ—কথা দুটো তাঁর মাথার মধ্যে বারবার দপদপ করে যেন নিয়ন আলোতে জ্বলে উঠছে এবং নিভে যাচ্ছে।

অন্য দিনের থেকে অনেক আগেই পিকলু ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। আজ যে সকাল থেকেই ঘুরে বেড়াবার প্রোগ্রাম। হুকুম সিংও আসছে। লালবাজারের দাদু প্রথমে ওকে দ্বিতীয় দিনের জন্যে ছাড়তে রাজী হচ্ছিলেন না। কিন্তু পিকলু টেলিফোনে এমনভাবে আব্দার করলো যে, তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

পিকলু দেখলো এ-বাড়ির দাদু অনেক আগেই উঠে পড়েছেন। কলম ও নোটবই নিয়ে তিনি কী সব হিজিবিজি দাগ কাটছেন। অঙ্ক মেলাতে না-পারলে পিকলু অনেক সময় ঐভাবে খাতায় দাগ কাটে।

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, "পিকলু, তুমি নিজের ক্যামেরায় গতকাল ক'খানা ছবি তুলেছো?"

পিকলু বললো, "ফিল্ম শেষ। এয়ারপোর্টে ওই বিরাট কুস্তিগীর সায়েব থেকে আরম্ভ করে, মিঃ আয়ার, রামুকাকু, হরিময়দাদু সবার ছবি তুলেছি।"

দাদু বললেন, "তা হলে এখনই গুঁইন স্টুডিওতে ওয়াশিং এবং প্রিন্টিংয়ের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।"

বাড়ির চাকর ভজুকে ডাকলেন ভবনাথ। ভজু এর আগেরবার ছবি নিয়ে বিপদ বাধিয়েছিল। ওয়াশিং শুনে ফিল্মটা সোজা গণেশ

ডাইংক্লিনিং-এ দিয়ে এসেছিল। পিকলু বললো, "গুঁইন স্টুডিও। আজ বিকেলেই প্রিণ্ট চাই।"

কিন্তু ক্যামেরা খুলে ফিল্ম বার করতে গিয়ে পিকলু আর্তনাদ করে উঠলো। ক্যামেরার মধ্যে কোনো ফিল্ম নেই!

"ফিল্ম পুরেছিলিস তো?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

দুদিন আগে পিকলু নিজের হাতে ক্যামেরা লোড করেছে। ঠাকুমা এসে সান্ত্বনা দিলেন, "মন খারাপ কোরো না, এখনই দুটো ফিল্ম আনিয়ে দিচ্ছি।"

বেবি ব্রাউনি ক্যামেরায় সুন্দর সুন্দর কত ছবি তুলেছিল পিকলু—সব নষ্ট হয়ে গেলো।

ভবনাথ গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন, "ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছিলে?"

সকাল থেকে পিকলু ক্যামেরাটা একেবারেই হাতছাড়া করেনি।

"ভাল করে ভেবে দ্যাখো," ভবনাথ বললেন।

"সত্যি একবারও হাতছাড়া করিনি"—শুধু সন্ধ্যেবেলায় ফেরবার পথে কর্নওয়ালিস হোটেলে একবার টয়লেটে যেতে হয়েছিল পিকলুকে। তখন ক্যামেরাটা কয়েক মিনিটের জন্যে বাইরে রেখেছিল।

ভবনাথ ওঁর নোটবইতে দু-একটা হিজিবিজি টানলেন। বললেন, "পিকলু, তুমি একবার তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে প্রফেসর মিহির সেনকে ডাকবে?" অন্য সময় হলে ভবনাথ নিজেই যেতেন, কিন্তু গতকালের পদস্খলনের ফলে পা-টা বেশ ফুলে উঠেছে, হাঁটা চলার উপায় নেই।

মিহির সেনকে নিয়ে পিকলু পাঁচ মিনিটেই ফিরে এলো। সাহিত্যিক ভবনাথ নিজেই ডেকেছেন শুনে মিহিরবাবু খুব খুশী। এই

মিহিরবাবুই একবার রাস্তায় ভবনাথকে বলেছিলেন, সর্দি সম্বন্ধে একখানা উপন্যাস লিখুন। ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু যে-হেতু মিহিরবাবু সর্দি-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লেগে রয়েছেন, সে-হেতু তাঁর হাসি আসে না। বেথেসডা সর্দি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সাড়ে তিন বছর কাজ করেছেন প্রফেসর সেন।

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মিহিরবাবু, জলে ভিজলে কতক্ষণ পরে সর্দি হয়?"

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রফেসর মিহির সেন বললেন, "একদম বাজে কথা—ঠাণ্ডা এবং জলে ভেজার সঙ্গে সর্দির কোনো সম্পর্ক নেই।"

"অ্যাঁ!" ঠাকুমা বিশ্বাসই করলেন না মিহির সেনকে। বললেন, "চিরকাল শুনে আসছি, ভিজে জামাকাপড় পরে থাকলে সর্দি হয়।"

মিহির সেন জোরের সঙ্গে বললেন, "মোটেই ঠিক নয়। পৃথিবীর বড়-বড় সর্দি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ঠাণ্ডা লাগিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজিয়ে, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা লোককে ভিজে মোজা পরিয়ে দেখা হয়েছে—একটুও সর্দি হয়নি। সর্দি হয় ভাইরাস থেকে। ভাইরাস সংক্রান্ত যে বিজ্ঞান তার নাম ভাইরোলজি।"

ভাইরাস কথাটা পিকলু শুনেছে বটে।

মিহিরবাবু বললেন, "অতি ক্ষুদি জিনিস এই ভাইরাস—অর্ডিনারি অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখাই যায় না। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে দেখাও অনেক সাধ্যসাধনার ব্যাপার। একইঞ্চি লম্বা জায়গায় কতগুলো সর্দির ভাইরাস লাইন দিতে পারে জানেন?"

পিকলু আন্দাজ করে নিয়ে বললো, "একশো-দেড়শো হবে।"

মিহির সেন চোখ বড়-বড় করে বললেন, "পঞ্চাশ হাজার। আমরা বলি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রন।"

মিহির সেন ভবনাথকে রিকোয়েস্ট করলেন, "করাইজা সম্বন্ধে একখানা উপন্যাস লিখুন। বছরে একশো কোটি টাকার বেশি জাতীয় লোকসান হয় এর থেকে, আমরা হিসেব করে দেখেছি। আমেরিকার বছরে ক্ষতি হয় ২৪০০০ কোটি টাকা।"

"করাইজা আবার কী?"

মিহির সেন বললেন, "ওঃহো! সাধারণ সর্দির ওইটাই বৈজ্ঞানিক নাম—আগে বলতো নেজাল ক্যাটার।" মিহির সেন আরও ব্যাখ্যা করলেন, "বছরে শতকরা পঁচাত্তর জন লোকের অন্তত একবার সর্দি হয়, আর শতকরা পঁচিশ জন লোকের অন্তত চার-পাঁচবার।"

এই সময় হরিময়বাবু গরম সোয়েটার পরে মাফলার জড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন। গরম কালেও একরম অদ্ভুত ড্রেস দেখে হাসি আসছে পিকলুর। কিন্তু হরিময়বাবুর মুখটা খুব করুণ হয়ে আছে।

মিহির সেনের কথা শুনে হরিময়বাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "তা হলে চমচম পত্রিকার একখানা করাইজা সংখ্যা বার করা যাক। সেই সঙ্গে ভবনাথ সেনের বিশেষ উপন্যাস 'সর্দি থেকে সাবধান'।"

কথা বলতে-বলতে হেঁচে উঠলেন হরিময়বাবু। হাঁচির ধাক্কা সামলে তিনি করুণভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "সর্দি কী করে হয়?"

মিহির সেন নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, "সর্দি প্রচারের সবচেয়ে সহজ উপায় হাঁচি। ছোট ছেলেরা আবার বড়দের থেকে অনেক বেশি সর্দি প্রচার করে। সর্দিওলা লোকের খুব কাছে গেলেও সর্দি হতে পারে।" এই বলে তিনি হরিময়বাবুর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেলেন।

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "সর্দির ভাইরাস কি দেহের বাইরে বাঁচে না?"

মিহির সেন বললেন, "বাঁচে না। তবে মাইনাস ৭৬° সেন্টিগ্রেডে ড্রাই-বরফের মধ্যে এক বছরের জন্যে সর্দি ভাইরাস রাখা যায়। অনেক দেশে মিলিটারিরা সর্দি নিয়ে গবেষণা করছে। যুদ্ধের সময় শত্রুসৈন্যের মধ্যে সর্দি ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা আছে।"

হরিময়বাবু আঁতকে উঠলেন। "ঠিকই তো! রণক্ষেত্রে সৈন্যরা হাঁচি সামলাবে না কামান বন্দুক ছুঁড়বে! আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝছি—কাল থেকে। অথচ এতোদিন আমার কখনও সর্দি হয়নি।"

মিহির সেন বললেন, "মানুষ এবং শিম্পাঞ্জী ছাড়া অন্য কোনো জীবের সর্দি হয় না।"

"এতোক্ষণে একটু আশার আলো দেখতে পেলাম।" রুমালে নাক মুছতে-মুছতে হরিময়বাবু বললেন, "ইস্কুলে কালীমাস্টার আমাকে যে গাধা বলতেন সেটা তা হলে কিছুতেই সত্যি নয়।"

ভবনাথ ততক্ষণ জানতে চাইছেন, "সর্দির ভাইরাস শরীরে ঢুকবার পরে সর্দির প্রকাশ হতে কত সময় লাগে?"

"ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলছেন?" মিহির সেন হেসে উত্তর দিলেন, "প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা। তবে শুনেছি, দু-চার জায়গায় এদের আরও তাড়াতাড়ি 'মানুষ' করবার চেষ্টা চলছে।"

"তাতে লাভ?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"লাভ, বলে লাভ," অধ্যাপক মিহির সেন উত্তর দিলেন। "বিশেষ করে সর্দিকে যেখানে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে সেখানে হাতে-হাতে ফল পেলে খুব লাভ।"

হরিময়বাবু করুণভাবে আবেদন করলেন, "সর্দির নাড়ি-নক্ষত্র তো আপনি জেনে বসে আছেন। সর্দি সারে কী করে একটু যদি বলে দেন। আমি খুবই 'সাফার' করছি।"

মিহিরবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "এখনও পর্যন্ত সর্দির কোনো চিকিৎসা বেরোয়নি। ওই যে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে বলে তার কারণ যাতে অন্য লোকের মধ্যে রোগটা না-ছড়ায়। বড়িই বলুন, মালিশই বলুন, নাকের ড্রপই বলুন—এসবে সাময়িক কষ্ট লাঘব হয়, কিন্তু সর্দি সারে না। কড়া ডোজের ওষুধে অনেক সময় ক্ষতি হয়—সর্দি আরও বেড়ে যায়।"

"কেন?" নাকে ওষুধ ঢালতে গিয়ে হরিময়বাবু থমকে দাঁড়ালেন।

মিহিরবাবু বললেন, "সিলিয়ার সর্বনাশ হয় ওষুধে। নাকের মধ্যে যে ছোট-ছোট চুল থাকে তার নাম সিলিয়া। নাকের চুল সর্দি আটকায়।"

চোখ দুটো বড়-বড় করলেন হরিময়বাবু। "নাকের চুল থাকলে আজ আমাকে এই কষ্ট পেতে হতো না।"

মিহিরবাবু চলে গেলেন। ভবনাথ এবার হরিময়কে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের ওই সিঙ্গারাভেলুর নাকের চুলগুলো কি খুব বড়?"

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে হরিময়বাবু বললেন, "ঠিকই! আপনি জানলেন কী করে? চোখে র‍্যাডার যন্ত্র লাগিয়ে নিয়েছেন নাকি? বাড়িতে বসে-বসেই সব দেখতে পাচ্ছেন!"

হরিময়বাবুকে পিকলুর ক্যামেরার ফিল্ম উধাও হবার ঘটনা বললেন ভবনাথ। হরিময়বাবু রীতিমতো আশ্চর্য হলেন। বললেন, "ভৌতিক ব্যাপার মনে হচ্ছে! কালকে আমার ভাইপো একখানা ছবি উপহার দিয়েছিল। ওই আশ্চর্য ক্যামেরায় ছবিটা তুললো নিজামের কাঠি কাবাবের দোকানের সামনে। ছবিখানা আমি ডায়রির মধ্যে রেখে-ছিলাম। কিন্তু বাড়িতে এসে সহ-সম্পাদককে ছবিটা দেখাতে গিয়ে বোকা বনে গেলাম। ছবি উধাও।"

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "আর কিছু স্পেশাল ঘটেছে গতকাল?"

হরিময়বাবু টাক মাথা চুলকোতে লাগলেন। তারপর উত্তর দিলেন, "বুড়ো মানুষ তো। রামুর স্পেশাল ক্যামেরাখানা আমার হাতে ছিল। গপ্পো করতে-করতে ক্যামেরাখানা নিয়েই আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা খেয়াল হলো মিনিবাস থেকে নামবার সময়। তা ভাবলাম, আজ সকালেই তো দেখা হচ্ছে। তখন দিয়ে দেবো'খন।"

"দেখি একবার ক্যামেরাখানা," ভবনাথ বললেন।

হরিময় দুঃখের সঙ্গে বললেন, "সে-গুড়ে বালি। বাড়িতে পৌঁছবার ঘণ্টা তিনেক পরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার হাজির। ক্যামেরাটা তখনই নিয়ে গেলেন।"

"একলা এসেছিলেন।" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"ট্যাক্সিতে বসে ছিলেন সেই বিরাট কুস্তিগীর সায়েব। তিনি ভিতরেও ঢুকলেন না। হাজার হোক, ভাইপোর বন্ধু। আমি কতবার রিকোয়েস্ট করলাম, ঘরে বসে একটু ঘোল খেয়ে যান। কিন্তু ওঁদের নাকি কর্নওয়ালিস হোটেলেই ডিনার পার্টি আছে—দু-একজন অতিথি আসছেন।"

"আপনার ঘড়িতে তখন ক'টা?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

হরিময়বাবু বললেন, "আপনার মতো আমি সবসময় ঘড়ি ধরে কাজ করি না। তবে অন্তত রাত পৌনে এগারোটা।"

ভবনাথ বললেন, "ওঁরা কর্নওয়ালিস হোটেলে আছেন তো? মিসেস এসকুইথ যে হোটেলটা চালান?"

হরিময়বাবু অত খবর রাখেন না। ভবনাথ এবারে ওঁর খাতায় কী সব হিজিবিজি টানলেন।

পিকলু ইতিমধ্যে কলকাতা-ভ্রমণের জন্যে রেডি হয়েছে। মাথায় একটা চমৎকার রুশী টুপি পরেছে পিকলু। যা সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

পিকলুর ঠাকুমা এই সময় ঘরে ঢুকে স্বামীকে বকুনি লাগালেন। "তোমার সব বাজে-বাজে কোশ্চেন রাখো। হরিময়বাবু, আপনি তো একলা মানুষ। অ্যাদ্দিন পরে ভাইপো ফিরলো, তাকে নিশ্চয় খাওয়াতে ইচ্ছে করছে ?"

হরিময়বাবু বুঝতে পারছেন, পিকলুর ঠাকুমা কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন। তিনি একটু হাসলেন।

ঠাকুমা বললেন, "আজ রাত্রে আপনারা সবাই এখানে খাবেন।"

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, "রামুকাকুর বন্ধু, মিস্টার আয়ার ?"

দিদিমা বললেন, "ওঁকেও বলবেন।"

হরিময়বাবু অনুরোধ করলেন, "যদি সম্ভব হয়, একটু পোস্ত-চচ্চড়ি করবেন। আমার ভাইপোটি খুব খেতে ভালবাসতো, কিন্তু ক্যালকাটার কোনো হোটেলে পোস্ত-চচ্চড়ি পাওয়া গেলো না।"

ভবনাথ সেন এখন আবার গড়গড়ার নল ধরে টানতে শুরু করেছেন। হুকুম সিংও হাজির হয়েছে।

হরিময়বাবু বললেন, "মিস্টার আয়ারের ইচ্ছে আজ প্রথমেই ধাপা এবং ট্যাংরা ঘুরে আসবেন। এগুলো কি দেখবার জায়গা ! দুর্গন্ধ !"

ভবনাথ বললেন, "যেখানেই যাও, যদি পারো, দুপুরে খাবার সময় একবার ফিরে এসো।"

পিকলু বললো, "লাঞ্চের সময় আমরা কোথায় থাকবো, কিছুই ঠিক নেই।"

"যদি না আসো, তাহলে একটা ফোন করে দিও," ভবনাথ সেন নাতিকে অনুরোধ করলেন।

পিকলুর ঠাকুমা অবাক হয়ে গেলেন। কর্তার আজ হলো কী! নাতির সঙ্গে এতো সময় খরচ করছেন!

পিকলুরা বেরোবার সময় হঠাৎ ভবনাথ সেন জিজ্ঞেস করলেন, "পিকলু, ফটোগ্রাফি কে আবিষ্কার করেছিলেন?"

কুইজ মাস্টার জেনারেল পিকলুর এসব উত্তর মুখস্থ। হরিময়বাবুকে অবাক করে দিয়ে পিকলু বললো, "দুজন ফরাসী, গত শতাব্দীতে। একজনের নাম ডি-নিপ্‌সে। আর একজনের নাম ডাগুরে।"

"আঃ! কী সব নামের ছিরি। অমন সব গুণী লোকের বাপ-মা ছেলের একটা ভদ্র নাম খুঁজে পেলো না!" বিরক্তি প্রকাশ করলেন হরিময়বাবু।

ভবনাথ বললেন, "কাছাকাছি ঐ সময়ে একজন ইংরেজও খুব দামী কাজ করেছিল।"

পিকলু চটপট বললো, "ফক্স ট্যালবট। তাঁর মাথায় হরিময়দাদুর মতো টাক ছিল—বুক অব নলেজে টাকের ছবি দেখেছি।"

নাতির সাধারণ জ্ঞানের বহর দেখে খুব খুশী হলেন ভবনাথ। হরিময়বাবুও খুশী, তবে অন্য কারণে। তিনি বললেন, "তাহলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, টাক জিনিসটা হাসাহাসির ব্যাপার নয়—বড়-বড় লোকের মাথাতেই টাক পড়ে। কী বলো হুকুম সিং?"

হুকুম সিং ব্যাচারা কী করে! খোদ ডি-সি সায়েবের মাথাতেও টাক আছে। সুতরাং সে সঙ্গে-সঙ্গে হরিময়বাবুর কথায় সায় দিলো।

"হ্যালো, লালবাজার পুলিস স্টেশন ?" ভবনাথ টেলিফোনে কথা বলছেন।

বেয়াই মশায়ের গলার স্বর শুনে ওদিক থেকে পুলিসের মস্ত অফিসার এবং পিকলুর মায়ের বাবা মিস্টার রঞ্জন সেন খুব খুশী হলেন।

পিকলু ইতিমধ্যেই বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছে শুনে মিস্টার সেন আরও খুশী হলেন। বললেন, "গতকালই রাত্রে একবার ওখানে যাবো ভাবছিলাম।"

"এলেন না কেন ?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"আসবো কী করে! বেরুতে যাচ্ছি, সেই সময় বিদেশ থেকে খবর এলো কয়েকটি খারাপ লোকের কলকাতায় আসবার সম্ভাবনা রয়েছে।" সেই নিয়ে খুবই ব্যস্ত রয়েছেন পিকলুর ছোট দাদু। বিদেশী খারাপ লোকেরা দেশের কী ক্ষতি করে যাবে কিছুই ঠিক নেই।

পিকলুর ছোট দাদু চমচমের বিজ্ঞাপনও দেখেছেন। সন্দেহ করছেন লেখাটা ভবনাথের। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই কি এবার আমাদের 'খারাপ লোকের খপ্পরে' পড়াচ্ছেন ?"

হা-হা করে হেসে উঠলেন, ভবনাথ। তারপর বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "পোস্টার পড়ে গেলো—কিন্তু এখনও একটা লাইন লেখা হলো না।"

রঞ্জন সেন বললেন, "আপনার কিছু চিন্তা নেই। খারাপ চরিত্রের অভাব হবে না। আমাদের পুলিস লাইনে বলে, লোক তিন রকম। কম খারাপ, বেশি খারাপ এবং একেবারে খারাপ! এর বাইরে লোক হয় না!"

কথাটা দ্রুত নোটবইতে লিখে নিলেন ভবনাথ। তারপর রঞ্জন সেনকে একবার দেখা করতে অনুরোধ করলেন। রঞ্জন সেন বললেন, "যদি পারি, দুপুরে কোনো সময়ে টুক করে ঘুরে আসবো। বিদেশের গোপন মেসেজ না-পেলে আজ বেশ একটু হাল্কা মেজাজে গপ্পো করা যেতো।"

ভবনাথ বললেন, "দুপুরে আসুন, না-আসুন, রাত্রে খেতে আসতেই হবে। গিন্নীর হুকুম। পিকলুর দিদিমাকেও সঙ্গে আনবেন।"

মেয়ের শাশুড়ীকে রাগাবার মতো সাহস নেই মিস্টার সেনের। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলন।

ভবনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "ফটোগ্রাফির ব্যাপারে পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে এসব খোঁজখবর রাখে এমন কোনো লোককে জানেন?"

মিস্টার সেন বললেন, "আমার ভাইপো সুখেন্দু রয়েছে। জার্মান ক্যামেরা কোম্পানিতে কাজ করে। দু সপ্তাহের ছুটি কাটাতে এখানে এসেছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবো'খন।"

এরপর কর্নওয়ালিস হোটেলে ফোন করলেন ভবনাথ। বললেন, "আপনাদের হোটেলে রাত এগারোটার সময় একটা পার্টি দিতে চাই।"

ওরা বললো, "অন্য হোটেলে চেষ্টা করুন। এ-হোটেলে রাত দশটার মধ্যে ডাইনিং হল্ বন্ধ হয়ে যায়।"
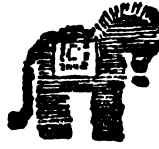
কর্নওয়ালিস হোটেলে রামানুজকাকু ও মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার পিকলুদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

হুকুম সিংয়ের সেলাম পেয়ে মিস্টার আয়ার যে খুব খুশী হলেন, তা পিকলু লক্ষ্য করলো। খুশী হবারই কথা—পৃথিবীতে ক'টা লোকই বা পুলিসের সেলাম পাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে? পিকলু নিজেও তো বোম্বাইতে পুলিস দেখলে ভয় পেতো। এবারেই লালবাজারে দাদুর কাছে কয়েকদিন থেকে তার ভয় ভেঙেছে।

পিকলু দেখলো সেই দশাসই সায়েব হোটেল লাউঞ্জে বসে আছেন। ভদ্রলোক লক্ষ্য করছেন, এদের দলে সবাই বারবার রুমাল বার করে নাক মুছছে। রামানুজকাকুও সর্দিতে ছটফট করছেন। সায়েব হঠাৎ পিকলুকে বললেন, "ভেরি ব্যাড প্লেস! এখানে আসা মাত্রই সবার সর্দি হয়।"

বম্বের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার বদনাম পিকলুর ভাল লাগলো না। সে প্রতিবাদ করলো, "কই? আমার তো হয়নি?"

সায়েব হেসে বললেন, "আই অ্যাম স্যরি। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

এরপর ভদ্রলোক ব্যাগ থেকে সেই সেণ্টের স্প্রে বার করলেন। এবং মজা করে পিকলুর গায়ে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে স্প্রে করলেন। কী সুন্দর

মিষ্টি গন্ধ। আঃ! পিকলু মুহূর্তের জন্য আনন্দে চোখ বন্ধ করলো।

ট্যাক্সির খোঁজে ওঁরা একসঙ্গে চৌরঙ্গীর দিকে বেরিয়ে পড়লো। পিকলু একবার হোটেলের টয়লেটে গিয়েছিল। টয়লেট থেকে বেরিয়ে দেখলো, মিস্টার আয়ার একটা ছবির প্যাকেট টেবিলে ফেলে গিয়েছেন। গতকালের তোলা ছবিগুলো মনে হচ্ছে। আলাদা-আলাদা স্বচ্ছ পলিথিন খামে রঙিন ছবিগুলো রয়েছে। ছবিগুলো সে দেখছে, দেখতে দেখতে কেবলই সে অবাক হয়ে যাচ্ছে। মিস্টার আয়ার হঠাৎ ফিরে এসে ছোঁ মেরে প্যাকেটটা পিকলুর হাত থেকে নিয়ে নিলেন। বললেন, "মিস্টার পিকলু, চলুন—সবাই আপনার জন্যে ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করছে।"

টিফিন টাইমে পিকলুরা বাড়ি ফিরতে পারলো না। ট্যাংরা পুলিস-ফাঁড়ি থেকে হুকুম সিং ফোনে পিকলুর সঙ্গে ভবনাথের যোগাযোগ করিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে ভবনাথ চিন্তিত মুখে ফোন নামিয়ে দিলেন।

পিকলুর ঠাকুমা বললেন, "ওরা তো বেশ হৈ-চৈ করছে। তুমি হঠাৎ বাংলা পাঁচের মতো মুখ করলে কেন?"

ভবনাথ আসল কারণটা বললেন না। মেয়েরা অল্পেতেই ভয় পেয়ে যায়। তাছাড়া পকলু টেলিফোনেই কয়েকবার প্রচণ্ড জোরে হেঁচেছে।

ভবনাথ নিজের নোট বইটা নিয়ে আবার কীসব লিখতে লাগলেন। পিকলু বলেছে, আজ সকালে সায়েব তার গায়ে সেণ্ট স্প্রে করেছেন। দু নম্বর; পিকলু বলেছে, দাদু তুমি বিশ্বাস করবে না, আমার মনে হলো দিলখুশা কেবিনের ছবিটা থেকে কবিরাজী চিকেন কাটলেটের গন্ধ বেরুচ্ছে।

ভবনাথ নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু পিকলুর একটা গুণ—কখনও বানিয়ে কিছু বলে না। তা ছাড়া, বাগবাজার স্ট্রীটের একটা ছবি থেকে খাঁটি সরষের তেলের গন্ধ পেয়েছে পিকলু। ছবিটা তোলা হয়েছিল একটা বেগুনি ফুলুরির দোকানের সামনে।

দুপুরের ভাত খাবার একটু পরেই পিকলুর ছোট দাদু রঞ্জন সেন রেডিও-টেলিফোনওয়ালা জীপ নিয়ে ভবনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে ক্যামেরাবিশারদ ভাইপো সুখেন্দু।

রঞ্জন সেন যে দু মিনিট গপ্পো করবেন তার উপায় নেই। রেডিও-টেলিফোনে দু-দুবার চার্লি পিটারের ডাক এলো। মিঃ সেন বললেন, "আর পারা যায় না। দেশের যা অবস্থা। আমাদের দেশ যে এগিয়ে যাক এটা অনেক দেশ চায় না। তারা সব সময় ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, কী করে আমাদের ক্ষতি করা যায়। আমাদের কাজও তাই বেড়ে যাচ্ছে। গতকাল থেকে গোপন মেসেজ পেয়ে সমস্ত জায়গা তন্ন-তন্ন করে খোঁজ করছি।"

"বাইরের লোকরা আর কী করতে পারে?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"পারে না এমন কাজ নেই। এরা আগুন লাগাতে পারে, পয়সা খরচ করে রায়ট বাধাতে পারে, হাওড়া ব্রীজের ক্ষতি করতে পারে, ট্রেন উল্টোতে পারে, ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন খারাপ করে দিতে পারে।"

আরও কথা হতো। কিন্তু রেডিও-টেলিফোনে আবার পিকলুর দাদুর ডাক পড়লো। তিনি বললেন, "সুখেন্দু, তুমি গপ্পো করো—আমি মিনিট পনেরোর মধ্যেই আসছি।"

ভবনাথ এবার সুখেন্দুবাবুকে বললে, "ফটোগ্রাফির ব্যাপারটা আমি একটু জানতে চাই।"

সুখেন্দু বললো, "মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে এই বিদ্যেটির যা উন্নতি হয়েছে, ভাবা যায় না। ১৮২২ সালে নিপ্‌সে প্রথম ফটো তুললেন। তারপর ডাগুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবিষ্কার হলো ডাগুরে পদ্ধতি। বাজারে প্রথম ক্যামেরা ছাড়লেন জিরো সায়েব ১৮৩৯ সালে। ১৮৪১ সালে ট্যালবট সায়েব তো ক্যালোটাইপ বার করলেন। তারপর থেকে হুড়-হুড় করে উন্নতি। ১৮৭১ সালে ম্যাডকস সায়েব বার করলেন ড্রাইপ্লেট প্রসেস। তারপর ১৮৮৮ সালে জর্জ ইস্টম্যান বার করলেন রোল ফিল্ম এবং কোডাক ক্যামেরা। এই কোডাক ক্যামেরা থেকেই অবিশ্বাস্য প্রগতি।"

ভবনাথ তাড়াতাড়ি লিখতে লাগলেন : "ফিল্মের পিছনে কালো কাগজ লাগানোর ব্যবস্থা হলো ১৮৯৪ সালে যাতে দিনের আলোতে ক্যামেরায় ফিল্ম ঢোকানো যায়। বিখ্যাত বেবি ব্রাউনি ক্যামেরা বেরুলো ১৯০০ সালে।"

ভবনাথ এবার সুখেন্দুর মুখের দিকে তাকালেন। সুখেন্দু বললো, "প্রথম রঙিন ছবি তুললেন লিপম্যান ১৮৯১ সালে। তারপর এই ১৯৪৭ সালে বেরুলো বিখ্যাত পোলারয়েড ক্যামেরা—বোতাম টেপার এক মিনিটের মধ্যে ছবি ছেপে ক্যামেরার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে। প্রথমে ছিল কেবল সাদা-কালো ছবি, তারপর বেরুলো রঙিন ছবি। এক মিনিট সময় কমে এখন হয়েছে দশ সেকেণ্ড।"

ভবনাথ বুঝলেন, এই রকম ক্যামেরাতেই গতকাল পিকলুর ছবি তোলা হয়েছে।

"এরপর কী?" প্রশ্ন করলেন ভবনাথ।

সুখেন্দু বললো, "এখন সবই সম্ভব। ত্রিস্তর ছবির ওপরে কাজ হচ্ছে। আরও কী হতে পারে ভগবান জানেন।"

ভবনাথ এবার সুখেন্দুর কানে-কানে কী এক প্রশ্ন করলেন। প্রশ্ন শোনা মাত্রই সুখেন্দু চমকে উঠলো। "আপনি জানলেন কী করে? হায়েস্ট মিলিটারি ডিপার্টমেন্টে এরকম একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু যতদূর জানি এখনও সফল হয়নি।"

ভবনাথ কিছুই বললেন না। সুখেন্দু ভাবলো, সাহিত্যিক মানুষ— মাথায় কখনও-কখনও অদ্ভুত খেয়াল চাপে।

একটু পরেই রঞ্জন সেন তাঁর জীপগাড়িতে চড়ে ভবনাথের বাড়িতে ফিরে এলেন। ভবনাথ সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে ঘরের এক কোণে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ওঁদের গোপন কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলছে। পিকলুর ঠাকুমা দূর থেকে ওই দৃশ্য দেখে হেসে ফেললেন। "দুই বেয়ায়ে কী এতো গোপন কথা হচ্ছে?"

পিকলুর ঠাকুমা চায়ের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রঞ্জন সেন বললেন, "আমাকে এখনই ছুটতে হবে—এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান।"

পিকলুর ঠাকুমা একটু বিরক্তই হলেন। রঞ্জন সেন বললেন, "রাগ করবেন না। রাত্রে তো স-গিন্নী আসছিই!"

মাঝখান থেকে সুখেন্দুরও চা খাওয়া হলো না। সেও কাকাবাবুর গাড়িতে ফিরে গেলো।

সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটার সময় পিকলু ও হরিময়বাবু ফিরলো হুকুম সিংয়ের সঙ্গে।

হরিময়বাবুর মুখ চুন। তাঁর ভাইপোর তোলা সমস্ত ছবি চুরি হয়ে গিয়েছে। "বিদেশীদের কাছে কলকাতার কোনো মানসম্মান রইলো না," দুঃখ করলেন হরিময়বাবু।

ধাপা, ট্যাংরা থেকে শুরু করে বড়বাজারের ময়লা ডিপোর ছবিও তোলা হয়েছিল আজ। দু-একজন পাবলিক আপত্তি তুলতে গিয়েছিল। কিন্তু হুকুম সিং সঙ্গে থাকায় শেষ পর্যন্ত কোনো অসুবিধে হয়নি।

সঙ্গে পুলিস থাকতেও কী করে ছবি চুরি হলো কেউ বুঝতে পারছে না। হুকুম সিং বললো, "পকিট মার নয়—ছিনতাই। একটা পাগলা কোত্থেকে এসে মিস্টার আয়ারের হাত থেকে ছবি নিয়ে ছুট দিলো।"

রামানুজকাকুর মন খারাপ। কিন্তু সবচেয়ে মুষড়ে পড়েছেন মিস্টার আয়ার।

"সামান্য ক'খানা ছবি গিয়েছে তো কী হয়েছে? কাল সকালে আবার ছবি তোলা যাবে।" রামানুজ বলেছিলেন মিস্টার আয়ারকে কিন্তু ভদ্রলোক এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ট্যাক্সি চড়ে হোটেলে ফিরে গিয়েছেন। বাধ্য হয়ে রামানুজকাকুও হোটেলে গিয়েছেন। একটু

পরেই দুজনে একসঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে আসবেন।

এতোক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা যে হরিময়বাবুর পক্ষে কষ্টকর তা ভবনাথ জানেন। তিনি গিন্নীকে বললেন, "একটু টমাটো জুস দাও।"

টমাটো জুস খেতে-খেতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেলো।

খিদেয় হরিময়বাবু ছটফট করছেন। কিন্তু বিশিষ্ট অতিথিদের এখনও দেখা নেই। কর্নওয়ালিস হোটেলে একবার ফোন করা হলো, কিন্তু কোনো খবর পাওয়া গেলো না। ওদের নাম করতেই কে যেন টেলিফোন কেটে দিলো।

পিকলুর দাদুরও দেখা নেই। যদিও লালবাজারের দিদিমা বিকেল-বেলাতেই চলে এসেছেন। তিনি সেই থেকে রান্নাঘরে ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করছেন। পুলিস-দাদুর ওপর রেগেমেগে দিদিমা বললেন, "ওঁর স্বভাবই ওই। ওঁর সঙ্গে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না এই জন্যে।"

ঠাকুমা এখন কিন্তু রাগ করলেন না। ভবনাথ সম্বন্ধে বললেন, "উনি তো এক কাঠি ওপরে। নেমন্তন্ন করেছে ওঁর টালিগঞ্জের মাসতুতো বোন, উনি ভুল করে আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন শ্রীরামপুরের মেসোর বাড়িতে!"

রাত অনেক হয়েছে। আর অপেক্ষা করা যায় না। পিকলুর ঘুম এসে গিয়েছে। ভবনাথ কোনো কথা বলছেন না। চিন্তিত হয়ে তিনি ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন।

আর দেরি করা সম্ভব নয়। ওঁরা খেতে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময় বাইরে জীপের আওয়াজ হলো।

রঞ্জন সেন হাসিমুখে ঘরে ঢুকে বললেন, "বদমাসগুলোকে অ্যারেস্ট করে হাজতে পুরে আসতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেলো। পুলিস

কমিশনার, হোম সেক্রেটারি এবং চীফ মিনিস্টারকেও ব্যাপারটা জানাতে হলো। সবাই খুব খুশী—ধন্য-ধন্য পড়ে গিয়েছে। যদিও খবরের কাগজে এখন কিছু বলা চলবে না—কয়েকটা দিন গোপন রাখতে হবে। আরও অ্যারেস্ট হতে পারে।"

হরিময়বাবু কিছুই বুঝতে পারছেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "কাদের অ্যারেস্ট করলেন?"

রঞ্জন সেন বললেন, "শত্রুভাবাপন্ন এক দেশ পাঠিয়েছিল ওই লয়েড এবং সিঙ্গারাভেলুকে উইথ টপ ডিফেন্স প্রোজেক্ট। ওরা নতুন এক টপ সিক্রেট ক্যামেরা বার করেছে স্মেলোমেটিক ০০১ ; এই ক্যামেরায় ছবি ছাড়াও গন্ধ ধরা পড়ে। বিজ্ঞানের আশ্চর্য এক আবিষ্কার—কিন্তু ব্যাটারা ওই দিয়ে আমাদের শহরের গন্ধ-ম্যাপ তৈরি করে নিচ্ছিল।"

"অ্যাঁ! বলেন কী।" হরিময়বাবুর ফেণ্ট হয়ে যাবার অবস্থা। "আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি।"

"বুঝতে পারবে কী করে? তোমার নাক তো সর্দিতে বন্ধ!" আচমকা উত্তর দিলেন ভবনাথ।

রঞ্জন সেন ও ভবনাথ দুজনে ফিসফিস করে কথাবার্তা বললেন। তারপর ভবনাথ গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন, "আমি যা ভয় পাচ্ছিলাম—ঠিক তাই। তোমার সর্দিটা সাধারণ সর্দি নয়—ওই দুষ্টু সায়েবটা সঙ্গে করে সর্দির ভাইরাস নিয়ে এসেছিল। স্পেশাল টাইপের ভাইরাস ছড়িয়ে দেবার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রচণ্ড সর্দিতে তোমার নাক বুজে গেলো। তুমি সন্দেহ করতে পারলে না যে, ওরা সিক্রেট ক্যামেরায় গন্ধের ছবি তুলছে। এই সব গন্ধ মারাত্মক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

"অ্যাঁ! আমি যে ভাবলাম সায়েব আমার গায়ে সেণ্ট-স্প্রে

করলো।" হরিময়বাবুর এবার অজ্ঞান হবার অবস্থা।

রঞ্জন সেন বললেন, "সিঙ্গারাভেলু আয়ার ইণ্ডিয়ান সিটিজেন, কিন্তু অনেক দিন দেশের বাইরে থেকে স্মাগলিং করছে। এবার এই ক্যামেরার গন্ধ-রঙিন ছবি তোলবার জন্যে বিদেশী শত্রু অনেক টাকা দিয়ে তাকে নিয়োগ করেছে। তবে পালের গোদা ওই লয়েড।"

"আমার ভাইপো! আমার ভাইপো!" কাতরভাবে কেঁদে উঠলেন হরিময়বাবু। "বংশের মুখ ডোবালো, সেও এর মধ্যে আছে নাকি?"

রঞ্জন সেন বললেন, "ও ব্যাচারা নিরপরাধ। কিন্তু একটুর জন্যে বেঁচে গেলো। রামানুজবাবু অর্ডিনারি একটা পোলারয়েড ক্যামেরা নিয়ে এসেছিলেন—ইচ্ছা, পুরানো স্মৃতিজড়ানো কিছু জায়গার ছবি তোলা। লয়েডের টপ সিক্রেট ক্যামেরাও একেবারে একই রকম দেখতে। ছবিও একই রকম উঠবে—কিন্তু সঙ্গে ধরা পড়বে গন্ধটা। এয়ারপোর্টে পিকলু এবং হরিময়বাবুর কথাবার্তা শুনেই লয়েড ও সিঙ্গারাভেলু কুমতলবটা আঁটে। ওরা বুঝতে পারে, সঙ্গে হুকুম সিং থাকলে ওদের ছবি তুলতে কোনোরকম অসুবিধে হবে না। যেখানে যা-খুশী ছবি তুলে নিয়ে ওরা আমাদের কলা দেখিয়ে চলে যেতে পারবে। একলা বিদেশীর পক্ষে কলকাতার পথে-ঘাটে ছবি তোলা একটু শক্ত।"

হরিময়বাবুর গলা দিয়ে ঘড়ঘড় করে আওয়াজ বেরুচ্ছে। "সত্যিই খারাপ লোকের খপ্পরে পড়েছিলাম আমরা!"

রঞ্জন সেন বললেন, "আপনার ভাইপোটিও খুব চালাক-চতুর নয়।"

"সে তো বটেই, সে তো বটেই। চালাক-চতুর হলে কখনও নিজের দেশ ছেড়ে চলে যায়!" মন্তব্য করলেন হরিময়বাবু।

রঞ্জন সেন বললেন, "ওরা যে কায়দা করে ক্যামেরাটা পাল্টে

নিয়েছে—তা বুঝতে পারেনি রামানুজ। তার ওপর রামানুজের নাকেও প্রচণ্ড সর্দি। ছবির গন্ধ-টন্ধ তেমন পাচ্ছে না—ফলে বেচারার কোনো-রকম সন্দেহ হয়নি। সিঙ্গারাভেলু জানতো সর্দি কমাবার আগেই ছবিগুলো ওরা হাত সাফাই করবে।"

"সর্দি হয়নি মাত্র দুজনের," চিৎকার করে উঠলেন হরিময়বাবু। "ওই দুষ্টু সিঙ্গারাভেলু আয়ার এবং পিকলুর।"

"সিঙ্গারাভেলু আয়ার নয়—ওর আসল নাম এ বি সি ডি রাও। অনন্ত বাসুদেবন চন্দ্রিকাপুরম দেবরাজ রাও। ভাইরাস ছাড়বার সময় যাতে ওর কিছু না হয়, সে জন্যেই তো নাকে বড়-বড় চুল রেখেছে। আর পিকলুর সর্দি না-হওয়াটা ছোটখাট একটা অ্যাক্সিডেণ্ট। ঘন-ঘন সর্দি হয় ওর—হয়তো ওর দেহের ভাইরাস শত্রুপক্ষের ছড়ানো নতুন ভাইরাসকে সুবিধে করতে দেয়নি। সামান্য ঘটনা। কিন্তু তার থেকেই ওদের বিপদের সূত্রপাত।"

ভবনাথ বললেন, "পিকলু যদি গতকাল ওর ছবিতে ঘেমো গন্ধের কথা না-বলতো তা হলে আমার সন্দেহই হতো না।"

হরিময়বাবু বললেন, "কী সর্বনাশ বলুন তো! দুর্দান্ত শত্রুপক্ষ আমাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে এভাবে আমাদের দেশের ক্ষতি করছিল। ধন্য আপনাকে—এ যাত্রায় খারাপ লোকগুলো ধরা পড়লো।"

রঞ্জন সেন বললেন, "ধন্যবাদ আমার একটুও পাওনা নয়। পুরো ক্রেডিট ভবনাথবাবুর। উনিই গত রাত থেকে একের পর এক রহস্যের পয়েণ্ট সাজিয়ে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক সর্দি ইনস্টিটিউট থেকে হঠাৎ সর্দি ভাইরাস চুরি হলো কেন? পিকলুর ছবিতে ঘেমো গন্ধ কেন? মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার রাত এগারোটার সময় কেন হরিময়বাবুর বাড়ি থেকে ছবি ফিরিয়ে নিতে এলেন? ট্যাক্সিতে কেন

ওই লয়েড সায়েব বসেছিলেন? কর্নওয়ালিস হোটেলে দশটার পরে ডাইনিং রুম বন্ধ হয়ে যায়—অথচ সিঙ্গারাভেল্লু কেন হরিময়বাবুকে মিথ্যে কথা বললো, হোটেলে রাত সাড়ে-এগারোটায় ডিনার পার্টি আছে। পিকলুর ব্রাউনি ক্যামেরা থেকে কেন ফিল্ম উধাও হলো? নিশ্চয় এমন কারও ছবি ওর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে যে নিজের প্রচার চায় না। সিঙ্গারাভেলুর নাকে অত বড়-বড় চুল কেন? ওর কেন সর্দি হলো না? যে-হরিময়বাবুর লাইফে কখনও সর্দি হয় না, হঠাৎ তাঁর কেন সর্দি হলো? তাছাড়া ভবনাথবাবু কিছুদিন আগে হঠাৎ স্বপ্ন দেখেছেন: নতুন ধরনের ক্যামেরা বেরিয়েছে যাতে রং ছাড়াও গন্ধ ধরা পড়ে। স্বপ্নেই নতুন এই ক্যামেরার নাম দিয়েছিলেন স্মেলোমেটিক! সরল মনে সাহিত্যিক ভবনাথ ভেবেছিলেন, নতুন এই ক্যামেরায় নতুন সম্ভাবনার দিক খুলে যাবে। কেবল সাজগোজ করেই তখন ছবি তোলা যাবে না—সঙ্গে স্নো এবং সেণ্ট মাখতে হবে। সামনে সুগন্ধী ফুলের গুচ্ছ থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু যা মিস্টার সেন ভাবতে পারেননি—তা হলো দুষ্টুদের হাতে পড়ে এই আবিষ্কারের অপব্যবহার হতে পারে। বিষাক্ত গ্যাসের ছবি তুলে পাঠালে—সেই ছবি দেখতে গিয়ে মানুষ খুন হতে পারে।”

বিস্মিত হরিময়বাবু উত্তেজনার বশে ঘন-ঘন টাকে হাতে দিতে লাগলেন। তারপর ভবনাথকে বললেন, “এ-সম্মান তা হলে সত্যিই আপনার প্রাপ্য। সময় থাকতে আপনিই মিস্টার রঞ্জন সেনকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাই খারাপ লোকগুলো ধরা পড়লো।”

রঞ্জন সেন বললেন, “দুষ্টুগুলো ধরা পড়লো—কিন্তু যন্তরটা পাওয়া গেলো না। আমার ডিটেকটিভরা ওকে ঘিরে ফেলেছে বুঝতে পারা মাত্রই ওই ব্যাটা লয়েড গোপন ক্যামেরাটা ধড়াম করে মাটিতে ফেলে

ভেঙে দিলো।”

“ছবিগুলোও তো হাওড়া ব্রীজের সামনে ছিনতাই হয়ে গেলো,” আফসোস করলেন হরিময়বাবু।

“ছিনতাই নয়। আমার প্লেন-ড্রেস সাব-ইনসপেকটর পাগল সেজে ছবির প্যাকেটটা ছিনিয়ে নেয়। তারপরেই তো আমি নিজে কর্নওয়ালিস হোটেলে গিয়ে লয়েডকে অ্যারেস্ট করি। আদালতে ওইসব ছবি উঠবে—তবে সিক্রেট আদালত, অফিসিয়াল সিক্রেট আইন অনুযায়ী বিচার হবে। বাইরে খুব বেশি জানানো হবে না।”

হরিময়বাবু চোখ বন্ধ করে মা কালীর উদ্দেশ্যে তিনবার প্রণাম জানালেন। ভাইপোটা যে অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছে তার জন্যে তিনি মায়ের কাছে দেড়সের চমচম মানত করলেন। রঞ্জন সেন বললেন, “ওঁর জন্যে চিন্তা করবেন না। ওঁর স্টেটমেণ্ট এখন থানার অফিসাররা লিখে নিচ্ছে। জল অনেক দূর গড়াবে। কারণ লয়েড স্বীকার করেছে, সর্দি ইনস্টিটিউটের ভাইরাস ওদের দলের লোকরাই চুরি করিয়েছে।”

পিকলু ও ভবনাথ দুজনেই আজ খুব খুশী। বাড়িতে এসেই পিকলু খবর পেয়েছে, বোন শতরূপার রোগটা তেমন কিছু নয়। ভেলোরের ডাক্তাররা বলেছেন, কয়েকদিন ঠিকমতন ওষুধ খেলেই তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

হরিময়বাবুর চোখদুটো এখনও চমচমের মতো হয়ে আছে। তিনি এবার ভবনাথকে বললেন, “চমচম পত্রিকার পক্ষ থেকে আপনাকে এক শিশি রাবড়িচূর্ণ এবং মালা পাঠাবো। ঘরে বসে-বসে এতো বড় একটা রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন আপনি।”

ইঙ্গিতে নাতিকে দেখিয়ে ভবনাথ বললেন, “ওসব পিকলুরই

প্রাপ্য। ও যদি এতো সজাগ না হতো, তা হলে কিছুই ধরা পড়তো না। আজও সে সাহস করে ভোরবেলায় কর্নওয়ালিস হোটেলে অন্য ছবিগুলো শুঁকে ফেলেছিল এবং আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল যে, দিলখুশা কেবিনের ছবি থেকে কবিরাজী কাটলেটের গন্ধ ছাড়ছে। ওর ফোন না পেলে সন্দেহটা আমার মনে দানা বাঁধতো না। আমি লালবাজারে খবর দেবার কথা ভাবতেই পারতাম না।"

বেজায় খুশী হয়ে বিদায় নেবার সময় হরিময়বাবু ঘোষণা করলেন, "শুধু মালা নয়—পিকলু যাতে পদ্মশ্রী পায় তার জন্যে আমি চমচমের পরবর্তী সংখ্যায় কড়া সম্পাদকীয় লিখবো।"

"সম্পাদকীয় কেন? সোজাসুজি সরকারকে লিখলে হয়," বললেন রঞ্জন সেন।

গম্ভীরভাবে হরিময় বললেন, "যদ্দূর জানি, একুশ বছরের কমে কাউকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয় না। সুতরাং চিঠির কম্মো নয়। সরকারী খেতাব পাবার বয়সটা কমিয়ে দশে আনতে হলে চমচমের জ্বালাময়ী এডিটোরিয়াল ছাড়া কাজ হবে না।"

বিরাট গল্প

কাকলির
দাত

দাছু, অর্থাৎ মায়ের বাবা, কলকাতায় আসছেন। আগাম খবরটা পেয়ে কাকলির বুকের ভিতরটা কীরকম সুড়সুড় করছে। বাঁদিকে বুকের কাছে কেউ পাখির পালক বুলিয়ে দিচ্ছে—এইরকম মনে হলেই বুঝতে হবে আনন্দ হচ্ছে, এ-কথা বাড়ির চাকর অভয়দার কাছে কাকলি শুনেছে।

"আঃ! কী আরাম! কী আনন্দ!" কাকাল খুশীতে চোখ বুজে ফেলে।

ছোট্ট মেয়ে কাকলির অনেক কিছু জানবার আগ্রহ। কাকলির নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বাড়ির ঝি মোক্ষদা বলেছিল, "কী অকালপক্ক মেয়ে গা! তোর মা এখনও অত কচি-কচি রয়েছে, তুই এমন হলি কেন গা?"

কী শক্ত কথা—অকালপক্ক। কাকলি মানে জিজ্ঞেস করতে মোক্ষদা মাসী বলেছিল, "অকালপক্ক মানে অকালপক্ক—আষাঢ় মাসে যে-আম পাকবার কথা, সেই-আম বোশেখ মাসের গোড়ায় পেকে বসে আছে।"

মোক্ষদা মাসী বড় চিৎকার করে—ওকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কাকলির খুব জানতে ইচ্ছে করে, দুঃখু কালে বলে। এই এখন যেমন আনন্দ হয়েছে বলে, কে যেন বুকের ভিতর পাখির পালক বুলিয়ে

দিচ্ছে—তুঃখ হলে কী হবে ?

কাকলি তখন আরও ছোট। কাকলির মনে আছে, তুপুরবেলায় মামার একটা ছবির দিকে মা তাকিয়ে ছিল। মার অমন ডাগর-ডাগর কালো চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল, ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের শাড়ির আঁচল দিয়ে মা ঘন-ঘন চোখ মুছছিল। কাকলি প্রথমে ভেবেছিল, মায়ের সর্দি হয়েছে, তাই হাঁসফাঁস করছে, নাক মুছছে। সর্দি লাগবে না! যা-ঠাণ্ডার দেশ থেকে মায়ের নামে চিঠি আসে দাহুর কাছ থেকে। মাকে সাবধান করে দিতে যাচ্ছিল কাকলি, "সোয়েটার পরে এই সব চিঠি খুললে পারো—তা হলে ঠাণ্ডা লাগে না।" মা যখন কোনো উত্তর দিলো না, তখন কাকলি বুঝলো সর্দি-কাশি কিছু নয়, মা কাঁদছে।

খিদে পেলে, রাগ হলে, পড়ে গেলে কাকলিও পা-ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। মাকে প্রশ্ন করে কাকলি জানতে পারলো, ওসবের কোনোটাই চোখ দিয়ে জল পড়ার কারণ নয়। মোক্ষদা মাসী ফিস-ফিস করে বললো, "তোর মায়ের তুঃখু হয়েছে।"

কাকলির চোখ তুটো ঠিক ওর মায়ের মতন। সে-তুটো বড়-বড় করে, মায়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে কাকলি জিজ্ঞেস করেছিল, "তুঃখ হলে কী করে বুঝতে পারো, মা ? মোক্ষদা মাসী বলছিল, বুকের মধ্যে ভগবান নাকি নংকা-বাঁটা গুঁজে দেয়।" মায়ের আঁচলটা সরিয়ে, বুকটায় হাত-বুলিয়ে দিতে যাচ্ছিল কাকলি। আদর করে চুমু খেয়ে কাকলিকে সরিয়ে দিয়ে মা বলেছিল, "কাকে সুখ বলে, কাকে তুঃখ বলে, সময় হলে সব জানতে পারবে, মা।"

সুখটা কাকে বলে, আজ এই মুহূর্তে বাবা ও মায়ের মুখ দেখেই বুঝতে পারছে কাকলি। দাহুর চিঠি এসেছে—দাহু আসছেন। মা

বললো, "আমি তো ভেবেছিলাম, বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। তাই তোমার কথা আর কাকলির কথা বারবার লিখে দিয়েছিলাম।"

কাকলি আনন্দে ডগমগ হয়ে বললো, "জানো বাবা, তিনটে-পাঁচটা বানান ভুল হলেও, দাত্নকে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম।"

বাবা এবার হেসে মাকে বললেন, "তুমি তো কতবার লিখেছো, কাজ হয়নি। এবার তা হলে কাকলির কথাতেই উনি আসছেন।"

কাকলির মা অদিতি প্রতিবাদ করলো না। কিন্তু হঠাৎ ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এটা তো জুলাই মাস?"

সবাই তো জানে এটা জুলাই মাস—প্রত্যেক ক্যালেণ্ডারে বড়-বড় করে লেখা আছে। কাকলি বুঝতে পারছে না, এই সামান্য ব্যাপারে মার মুখটা অমন শুকিয়ে গেলো কেন? বাবাও যেন কেমন! মা ফ্যাল-ফ্যাল করে জুলাই মাসের দিকে তাকিয়ে আছে—তবু কিছু বলছে না মাকে।

কাকলির এখন সময় নেই। প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে পাশের বাড়ির চারতলার ফ্ল্যাটে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চললো। বেল টিপতেই বন্ধুর দাদা নন্দন দরজা খুলে দিলো। রীতিমতো গম্ভীরভাবে কাকলি জিজ্ঞেস করলো, "আরতি আছে?"

আরতির দাদাও গম্ভীরভাবে বললো, "ভিতরে গিয়ে ভাখো—একটু আগেই তো ঘুম থেকে উঠলো। অনেকক্ষণ ভোঁসভোঁস করে ঘুমিয়েছে।"

আরতির কী মজা—ওর মামার বাড়ি কলকাতায় কালীঘাটে। কথায়-কথায় আরতি দাত্নর কাছে চলে যায়। এমন কোনো সপ্তাহ যায় না, যখন না আরতির সঙ্গে দাত্নর দেখা হয়। আজ কিন্তু আরতিকে

তাক লাগিয়ে দেবে কাকলি।

নানা-রংয়ের গ্রীল দিয়ে ঘেরা বারান্দার এক কোণে আট বছরের আরতি নিজের ঘরসংসার গোছাচ্ছিল। আরতির গলা শোনা যাচ্ছে : "তোদের নিয়ে আর পারি না। একদিন বাইরে গেছি, আর বাড়িতে লংকাকাণ্ড বাধিয়েছিস।"

"কাকে বকছিস?" কাকলি ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে।

"ছোট মেয়েটাকে," গিন্নী-বান্নির মতো উত্তর দেয় আরতি। পুতুলটার মুখ রুমাল দিয়ে মুছতে-মুছতে আরতি বললো, "তোমাদের জন্যে আমি কি 'চল্লিশ' ঘণ্টা ঘরে বন্দী হয়ে থাকবো? আমার কি সাধ-আহ্লাদ নেই?" এবার বন্ধুর দিকে মুখ ফিরিয়ে আরতি গম্ভীরভাবে বললো, "কালি-ঝুলি মেখে পেত্নীর মতো চেহারা করেছে—তোরা ভাববি এদের মা কিছু দেখে না।"

পাকা গিন্নীর মতো কাকলি বললো, "দিন রাত বকলে ছেলেমেয়ে খারাপ হয়ে যায়। সেদিন বাপি মাকে আড়ালে বলছিল, আমি শুনে ফেলেছি। তুই রাগিস না—আমাকে একটু জল দে, আমি মেয়েটাকে চান করিয়ে দিচ্ছি।"

"ওরে বাবা, মরে গেলেও না—সাত সকালে ঠাণ্ডা জল ওর সহ্য হবে না।" আরতি শিউরে উঠলো।

মিষ্টি ডলপুতুলটাকে কোলে নিয়ে স্নান করাবার ইচ্ছে ছিল কাকলির। কিন্তু আরতিটা যেন কেমন! নিজের ছেলেমেয়েদের দিন-রাত বকুনি লাগাবে, মারবে ধরবে, কিন্তু অন্য কাউকে আদর করতে দেবে না।

"ঠাণ্ডা কোথায়?" কাকলি একটু রেগেই জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটাকে কোলে নিয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে মুছতে-মুছতে আরতি বললো, "ওর যে আমার মতো টনসিল আছে। জন্ম থেকেই ভুগছে।"

এই মেয়ের নাম কাকলিই দিয়েছে—সোমা চ্যাটার্জি। বেশি বয়স না—এই তো কয়েক সপ্তাহ আগে দাত্বর বাড়ি থেকে ফিরবার সময় আরতি ওকে নিয়ে এলো। পার্ক স্ট্রীটের প্যারাগন থেকে আরতির দাত্থ নিজে পছন্দ করে কিনে এনেছেন। খুব ছোট্ট মেয়ে—এখন মাত্র আট-ন' বছর বয়স হয়েছে।

লাল টুকটুকে মেয়ের কোঁকড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে আরতি ওকে কোলে তুলে নিলো। ওর মুখে চুমু খেয়ে আদর করলো, "ত্নষ্টু মেয়ে, কিন্তু মিষ্টি মেয়ে।"

অধৈর্য হয়ে ওঠে কাকলি। "অমনভাবে তাকাস না। নজর লেগে যাবে।"

নজর লাগলে যে শক্ত অসুখ হয় তা আরতির অজানা নয়। তাই সে প্রতিবাদ করলো, "যাঃ, মায়ের নজর লাগে না—সেদিন মাসীকে বলছিল দিদিমা।"

মেয়ে-পুতুলটার ওপর কাকলির একটা চাপা আকর্ষণ আছে। ওকে বুকের কাছে নিয়ে খুব আদর করতে ইচ্ছে করে। ভয় লাগে ওর নজর না-লেগে যায়—হাজার হোক সে তো পুতুলটার মা নয়। কথাটা ভুলবার জন্য কাকলি বলে, "হাঁ করে অমন দেখছিস কী?"

আরতি এবার জিজ্ঞাসা করে, "ওকে ঠিক আমার মতো দেখতে হয়েছে, তাই না?"

"নিশ্চয়ই হয়েছে—মেয়েরা তো হয় মা না-হয় বাবার মতো দেখতে হয়।"

কাকলিকে দাত্নু-দিদিমার নতুন গল্প শোনায় আরতি প্রত্যেকবার। দাত্নুর বাড়িতে গেলেই কত রকমের ঘটনা ঘটে, সেসব কাকলিকে না বলা পর্যন্ত আরতির ভাত হজম হয় না। মামার বাড়িতে গিয়ে আরতি দাত্নু এবং দিদিমার মধ্যিখ্যানে শোয়। দিদিমা অনেকক্ষণ ধরে নাতনীর পিঠে সুড়সুড়ি দেয়, আর দাত্নু রাজপুত্তুর-রাজকন্যাদের গল্প বলেন। "জানিস কাকলি একটা রানী না এমন দুষ্টু, মন্তর পড়ে নিজের সৎ ছেলেদের হাঁস করে দিয়েছিল ; আর মেয়েকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল।"

"কী দুষ্টু, বলো তো!" কাকলি নিজেও খবরটা শুনে খুব রেগে গিয়েছিল রানীর ওপর। কাকলিকে কেউ গল্প বলবার নেই—মা অত গল্প জানে না, জানলেও বলবার ধৈর্য নেই। "হাঁস হয়ে গেলে খুব কষ্ট তাই না?" অজানা রাজপুত্রদের জন্যে চিন্তা হচ্ছিল কাকলির।

"কষ্ট বলে কষ্ট!" আরতি উত্তর দেয়। "বলা নেই কওয়া নেই, তোকে-আমাকে যদি কেউ হাঁস করে দেয় কী অবস্থা বল তো? ইস্কুল যাওয়া বন্ধ, মাংসের হাড় চিবোনো বন্ধ, দাত্নুর পাশে শোওয়া বন্ধ—দিনরাত শুধু জলে সাঁতার দাও আর প্যাঁক-প্যাঁক করো। ভাগ্যে আমাদের সৎমা নেই!"

কাকলি আর খবরটা চেপে রাখতে পারলো না। তার দাত্নুও যে এবার কলকাতায় আসছেন, সে-খবরটা বন্ধুকে জানিয়ে দিলো। দাত্নু আসেন না বলে বন্ধুর যে খুব দুঃখ ছিল তা আরতির অজানা নয়। তাই খুব খুশী হলো সে। কিন্তু কাকলির মাথার দিকে তাকিয়ে সে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো। খুব বকুনি লাগালো বন্ধুকে। "নেড়া হবার আর সময় পেলি না?"

"নেড়া হলে যে রাজকন্থের মতো চুল হয়, মা বলেছে।" কাকলির

এই উত্তর শুনে মোটেই সন্তুষ্ট হলো না আরতি। তার চিন্তা, ওর দাহু যদি আরতির দাহুর মতো নাতনীকে বিয়ে করতে চায়। "নেড়ী অবস্থায় কী করে বিয়ে করবি ?" মুখ ভেঙচায় আরতি।

অজানা ভয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে কাকলি। অজান্তে নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে নেয়। ব্যাপারটা সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আরতি ফিস-ফিস করে বললো, "আমাকে বিয়ে করবার জন্য দাহু উঠে পড়ে লেগেছে। এখন থেকেই ছোটগিন্নী বলে ডাকে। আমি মুখের ওপর বলে দিয়েছিলাম, ওই রকম জ্বালাতন করলে তোমাদের বাড়িতে আর আসবো না। ওইরকম বুড়োকে কেন বিয়ে করবো বল তো ? মাথার চুল শাদা, অর্ধেক দাঁত নেই। দাহু এমন অসভ্য, বলে কিনা তোমারও তো চার-পাঁচটা দাঁত পড়েছে।"

"তারপর ?" জিজ্ঞেস করে কাকলি। এমন গোপন খবর সে আর আগে কখনো শোনেনি।

আরতি এখন যে দাহুর ওপর কিছুটা সদয় হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। সে বললো, "অতো বকলাম দাহুকে, তবু কিছু হলো না। প্রত্যেকবার আমাকে খেলনা এনে দেবে—জামা কিনে দেবে। এবার ক্যাডবেরি দিয়েছে হুখানা।"

হাতব্যাগ থেকে চকোলেটের প্যাকেট বার করলো আরতি। "তোর জন্যে আধখানা রেখেছি, খেয়ে ছাখ।"

চকোলেট মুখে পুরে ওরা হুজনে চুষতে লাগলো। কাকলি পরামর্শ দিলো, "রোজ যদি চকোলেট দেয় তা হলে দাহুকে বিয়ে করা ভাল।"

প্রবল আপত্তি জানালো না আরতি। নিজের সমস্যা সমাধান

করে সে এবার বললো, "তোর দাদু এতোদিন কোথায় ছিল ?"

দাদুর কথা একটুও মনে পড়ে না কাকলির। বন্ধুর কাছে আজ সে বেশ লজ্জায় পড়ে যাচ্ছে। কাকলি শুনেছে, দাদু মস্ত লোক। গভরমেণ্টের বিরাট চাকরি করেছেন দাদু। দেশ-বিদেশ কত জায়গায় ঘুরেছেন দাদু—ওয়াশিংটন, টোকিও, নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারি, হংকং, কায়রো। কত সব অদ্ভুত জায়গার নাম করে মামণি। দাদুর সব কথা মামণির কাছে জেনে নিতে হবে।

"ওমা! দাদুকে তুই দেখিস নি কী করে বললি?" মেয়েকে জড়িয়ে ধরে অদিতি আদর করলো।

দিল্লির হাসপাতালে কাকলি যখন হলো, তখন দাদুই তো প্রথম তার মুখ দেখেছিলেন। দাদুর গাড়ি চড়েই তো হাসপাতাল থেকে বাড়ি গিয়েছিল কাকলি। ছবির অ্যালবামে দাদুর কোলে-চড়ে একটা রঙিন ফটো আছে—সেটা তোলা হয়েছিল প্যারিতে।

"ওমা! আমি বুঝি প্যারিতে গিয়েছি।" অবাক হয়ে যায় কাকলি।

"নিশ্চয় গিয়েছিস। দাদুই তো আমাকে আর তোকে নিয়ে যাবার প্লেনভাড়া পাঠিয়েছিলেন। দাদু তখন ওখানেই চাকরি করতেন।"

কাকলি এবার একটু শান্ত হলো। অদিতির মনে পড়লো, প্যারিতে বাবার সঙ্গে আরও অনেক ছবি তোলার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কাজ আর কাজে বাবা সব সময় ডুবে থাকতেন। যেদিন ওদের মোটরে প্যারি থেকে বেরিয়ে যাবার কথা সেদিনই দিল্লি থেকে কী এক গোপন খবর এলো।

বাবা বললেন, "দেশের অবস্থা ভাল নয়, যে কোনো মুহূর্তে শত্রুরা আমাদের দেশের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে।" বাবা তখনই ছুটলেন, ফরাসী সরকারের কোন এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে গোপন

আলোচনা করতে।

অদিতির ছুটি ফুরিয়ে আসছিল। বাবাও নানা কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন—বিদেশে ইণ্ডিয়ার রাষ্ট্রদূতদের কী এতো কাজ থাকতে পারে ভগবান জানেন। কিন্তু সেসব গোপন ব্যাপার—বাবা কোনোদিন বাড়িতে ফিরে অফিসের গল্প বলেননি।

মা যখন বেঁচেছিলেন, তখন দু-একবার এ-বিষয়ে খোলাখুলি অভিযোগ করেছেন: "আমরা কিছু তোমাদের কথাবার্তা শত্রুদের কানে তুলে দিতে যাচ্ছি না।" বাবা নীরবে হেসেছেন, কোনো উত্তর দেননি।

"ভীষণ গম্ভীর এবং কড়া মানুষ তোমার দাদু।" অদিতি মনে করিয়ে দিলো কাকলিকে।

এ আবার কী কথা বলছে মা? দাদারা কখনও কড়া হয় না! কাকলির মা বললো, "তুমি যেমন বাপির কোলে বসে যা-খুশী ইয়ারকি করছো, ফোন তুলে আপিসে বাপিকে হাজার রকম হুকুম করছো, এসব আমি এবং তোমার মাসী ছোট্টবেলায় কখনোই সাহস পেতাম না।" দুজন ছাড়াও আর একজনের কথা আচমকা মনে পড়ে গেলো অদিতির।

মায়ের মেঘলা মুখ দেখে কাকলিও বলতে পারে, মা এই মুহূর্তে মামুর কথা ভাবছে। কী একটা অদ্ভুত নাম ছিল মামুর। কেনিয়া-মামুর কোলে তোলা কাকলির একটা রঙিন ছবি আছে। মায়ের বন্ধু খুকুমাসী ভেবেছিল ওর নাম কানাই।

মা বলেছিল, "ওর নাম মোটেই কানাই নয়—বাবা তখন কেনিয়াতে পোস্টেড। ওইখানেই ওর জন্ম—তাই সবাই ওকে কেনিয়া বলে ডাকতো।"

ছবির অ্যালবামে হাত দিয়ে কেনিয়া-মামুর রঙিন ফটোর সামনে এসে মা থমকে দাঁড়িয়েছে। মায়ের চোখে জল—কেনিয়া-মামুর সম্বন্ধে কথা উঠলেই মা কেঁদে ফেলে। আরতিকে ব্যাপারটা বলেছিল কাকলি। আরতি বলেছিল, "ছ্যাখ, হয়তো তোর মামু পৃথিবী ছেড়ে আকাশে তারা হয়ে গিয়েছে। মরে গেলে মানুষ আকাশের তারা হয়ে যায়, জানিস তো? দূর থেকে ওরা সব কিছু ছ্যাখে, কিন্তু কিছুতেই কাছে আসতে পারে না।"

কেনিয়া-মামুকে বেশ মনে আছে কাকলির। সেবার এখানে এসে ক'দিন থেকে গেলো। কাকলিকে নিয়ে চিড়িয়াখানা, মড়া সোসাইটি, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল এইসব দেখিয়ে এনেছিল মামু। আর যাবার সময় ব্যাগ থেকে বার করেছিল—কালো কুচকুচে একটা ভাল্লুক। কোথায় যে মামু ভালুকটাকে লুকিয়ে রেখেছিল, কাকলি বুঝতে পারেনি। জানতে পারলে, অনেক আগেই ওটাকে ব্যাগ থেকে সে বার করে নিতো।

আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছে কাকলি। সবগুলোকে একরকম মনে হয়—এর মধ্যে কোনটা যে কেনিয়া-মামু তা কাকলি বুঝতে পারে না। দাদু নিশ্চয় চিনবে। দাদু আসুক, ওকে বলতে হবে, দেখিয়ে দাও।

মা সাবধান করে দিয়েছিলেন, "সবার দাদু সমান নয়। তোমার দাদু আরতির দাদুর মতো নয়। বাবা ভীষণ গম্ভীর—আমারও কথা বলতে সাহস হয় না।"

কাকলি ওসব বিশ্বাস করে না। পাছে কাকলি দাদুকে জ্বালাতন করে তাই আগে থেকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কাকলি কোনো কথা শুনবে না, দাদুকে খুব বকবে। জিজ্ঞেস করবে, আরতির দাদুর

মতো প্রত্যেক শনিবারে নিজের মেয়েকে দেখে যেতে পারো না? তারপর কাকলি আরও অনেক কিছু হুকুম করবে—সেসব মা জানতেও পারবে না। কারণ রাত্রে লুকিয়ে-লুকিয়ে দাদুর বিছনায় শুয়ে গোপন কথাবার্তা হবে।

দাদুর সঙ্গে দিদিমা থাকলে বেশ মজা হতো—দাদু যখন গল্প করতো, তখন দিদিমা পিঠ চুলকে দিতো। দিদিমাও কবে আকাশের তারা হয়ে গিয়েছে—সেই কাকলি জন্মাবার আগেই। দাদুটা যেন কেমন—দিদিমা নেই, মামা নেই, একা-একা আসবে।

কাকলি একমনে অ্যালবামে দাদুর ছবিগুলো দেখছে। মায়ের সঙ্গে, কেনিয়া-মামুর সঙ্গে, কানাডা-মাসীর সঙ্গে, দিদুর সঙ্গে তোলা ছবি বেশি নেই। বেশির ভাগ ছবি অচেনা সব লোকের সঙ্গে। মা বলেছে, "এরা মোটেই অচেনা নয়, বড় হয়ে বুঝবে এরা সব মস্ত লোক। সবাই এদের এক ডাকে চেনে—জাপানের সম্রাট, হল্যাণ্ডের রানী, কানাডার প্রাইম মিনিস্টার আরও সব কত কী।"

কাকলি এই সব লোককে দেখে কোনো আগ্রহ পাচ্ছে না—যেসব লোককে চিনি না তাদের সঙ্গে ছবি তুলিয়ে লাভ? মা বললো, "তোমার দাদু যে মস্ত কাজ করতেন।"

কাকলি অনিচ্ছার সঙ্গে সেইসব ছবি দেখছে—আর সেই ফাঁকে মা ভাবছেন, বাবার কর্মজীবন এবার শেষ হয়েছে। ফরেন সার্ভিসে দেশে-বিদেশে জীবনটা কাটিয়ে বাবা এবার কোথায় জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটাবেন? বাবা ফিরে এসে দিল্লিতেই বাড়ি নিয়েছেন। নির্মল চৌধুরীর নাম দিল্লিতে সকলে একডাকে চেনে। এখানেও সবাই শুনেছে তাঁর নাম—নির্মল চৌধুরীর বড় মেয়ে বলেই তো সমাজে অদিতির পরিচয়।

একবার গুজব উঠেছিল, নির্মল চৌধুরী বাংলার লাটসায়েব হচ্ছেন। তখন তো কত লোক অদিতিকে ফোন করেছে। সেকালের সরকারী কর্মচারী নির্মল চৌধুরী—নিজের মেয়েকেও গোপন সরকারী প্রস্তাবের কথা লিখবেন না। কাকলির বাবা সেইসময় দিল্লি গিয়েছিলেন, ফিরে এসে বললেন, কথাটা ঠিক। প্রাইম মিনিস্টার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু বাবা রাজী হলেন না। "এখন আর কিছু ভাল লাগে না," বাবা বলেছেন জামাইকে।

কাজ ভাল লাগে না, এমন যে বাবার কখনও হতে পারে, তা অদিতির স্বপ্নেরও অগোচর। খোকা সব গোলমাল করে দিলো। ট্রাঙ্ক কলে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অদিতি ছুটে গিয়েছিল চণ্ডীগড়ে। তখন সব শেষ। যে লরি-ড্রাইভারটা খোকনকে চাপা দিয়েছিল, সে ধরা পড়েছিল। নির্মল চৌধুরীর ছেলের স্কুটার চাপা দিয়ে তার মুক্তি নেই। কিন্তু সে বলেছিল, তার দোষ নয়, স্কুটারটা যেন ইচ্ছে করেই তার লরির সামনে এসে পড়েছিল। সে-কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। কড়া সাজা হয়ে গিয়েছিল ড্রাইভারের।

সে থেকে কী যে হলো, বাবা চণ্ডীগড়ের কাজকর্ম ছেড়ে দিল্লিতে এসে বসলেন।

প্রতি বছর খোকার মৃত্যুদিনে ইংরিজী কাগজে বাবা একটা বিজ্ঞাপন দেন, আর দুই মেয়ের কাছে দু'খানা কেক পাঠান। সে-এক যন্ত্রণা, চোখের জলে ভাসতে-ভাসতে কেক ভাগ করতে হয়। কেন যে বাবা এই কেক পাঠান, তা অদিতি জানে না, বাবাকে জিজ্ঞেস করতেও পারে না। বোধহয় খোকা কেক ভালবাসতো বলে। কিংবা, কাকলির মতোই বাবাও ভাবেন, খোকা ঐদিন আকাশের তারা হয়ে গেলো। ওর পুনর্জন্ম হলো।

ওইদিন মায়ের অবস্থা দেখে কাকলি ভয় পেয়ে যায়—জিজ্ঞেস করে, "মা কাঁদছো কেন ? তোমার বাপি নিজে কেক নিয়ে আসেনি বলে ?"

না, এখন এসব দুঃখের কথা অদিতি ভাববে না। মেয়েকে বললো, "তুমি খেলা করোগে যাও।"

দাতু আসবে বলে সেই সকাল থেকে কাকলি উঠে পড়ে লেগেছে। তুদিন ধরে সার্ফের গুঁড়ো দিয়ে পুতুলদের জামাকাপড় নিজেই কেচেছে। ছেলেদের গায়ে পাউডার মাখিয়েছে, চুল আঁচড়ে দিয়েছে। দাতুকে একবার লিখেছিল কাকলি, "আমার চার ছেলে। খুবই অবাধ্য, পড়াশোনায় মন নেই। বড় তুই ছেলে চাকরি করছে।"

ছেলেদের মধ্যে বড়র বিয়ে হয়েছে। বিয়ে-করা অবস্থায় বাপি ওকে বোম্বাই থেকে কিনে এনেছিল। কী সুন্দর রাঙা টুকটুকে ছেলে। বউমাটিও সুন্দরী, কিন্তু সালওয়ার পাজামা পরা, গায়ে রঙিন ওড়না, নাকে নথ। বাপির যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে। জেনেশুনে পাঞ্জাবী বউ নিয়ে এলো। অন্য কোনো কষ্ট হচ্ছে না—শুধু ওকে সাজাবার সময় কাকলিকে হিন্দিতে কথা বলতে হয়। কাকলি দেখেছে বাংলায় কথা বললে পুতুলটা কিছুই বুঝতে পারে না, ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

"দেখো, দাতুর কাছে যেন আমার মুখ নষ্ট না হয়। তোমরা মোটেই তুষ্টুমি করবে না, আমি যা বলবো, তা শুনবে," ছেলেদের এবং বউমাকে সাবধান করে দিয়েছে কাকলি। "যদি কথা না-শোনো, কয়লার গাদায় ফেলে দিয়ে আসবো, ওখান থেকে ইঁতুরে টেনে নিয়ে যাবে।"

এমন সময় দাদু এলেন। প্রথমে একটু লজ্জা-লজ্জা করছিল কাকলির। মাথাটা ঠিক এই সময় নেড়া।

দাদু জামাকাপড় পাল্টে ওর দিকে তাকালেন। বড় মেয়ের একমাত্র সন্তান, মেজমেয়ের কোনো ছেলেপুলে হয়নি। আর খোকার—নির্মল চৌধুরীর মনের মধ্যে হঠাৎ কাঁটাটা খচখচ করে উঠলো। হিসেব করে তিনি দেখলেন, খোকা বেঁচে থাকলে এতো দিনে হাতের গোড়ায় একটা নাতি-নাতনী থাকতো। অদিতির মেয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন রিটায়ার্ড অ্যামবাসাডার নির্মল চৌধুরী। বিরাট চেহারা তাঁর। গায়ের রং সোনার মতন। চুলে পাক ধরেছে। চোখে চশমা—মোটা কাঁচের রংটা ফিকে নীল।

খুব লজ্জা করছিল কাকলির। দাদু এমনভাবে ওর দিকে তাকাচ্ছেন! দাদু ভাবছেন, কী মিষ্টি দেখতে হয়েছে মিঠু ওরফে অদিতির মেয়ে। মেমসায়েবদের হার মানায় ওর গায়ের রং। টানা-টানা চোখ দুটোয় একটু নীলের আভা—এটা ওর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে কাকলি। নরম-নরম গোল-গোল হাত দু'খানার দিকেও তাকিয়ে খুব আনন্দ পেলেন নির্মল চৌধুরী। মনে পড়লো, ওয়াশিংটনের এক ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে বিরাট সাইজের এক ডলপুতুল দেখেছিলেন নির্মল চৌধুরী। সেই পুতুলটা কিনে দেবার জন্যে অদিতি তখন খুব বায়না করেছিল। দোকানের ম্যানেজার জানিয়েছিল, ওই পুতুল বিক্রির জন্যে নয়। তখন অদিতির কী কান্না! মিঠুর কি সে কথা মনে আছে? এখন তো সে একটা জ্যান্ত ডলপুতুল পেয়েছে।

অদিতি দেখলো অমন যে গম্ভীর বাবা তাঁকেও পোষ মানিয়ে নিয়েছে কাকলি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। অদিতি বলেছিল, "দিনরাত

পাকা-পাকা কথা বলে। আর ওর বাবা একটুও বকবে না। তোমার অসুবিধে হলে বকুনি লাগিও।"

কাকলি ভেবেছিল দাদুর ব্যাগের মধ্যে অনেক পুতুল থাকবে। পুতুল নেই। তার বদলে অনেক বই। বাপির জন্যে বই, নিজের মেয়ের জন্যে বই, কাকলির জন্যে বই এনেছে দাদু। বই আবার মোটেই পছন্দ হয় না কাকলির। দাদুটার ওপর রাগ হচ্ছে কাকলির—সঙ্গে দু-একটা পুতুল আনতে পারলো না? মা শুনলে রেগে যাবে। বলবে, পুতুলের ভিড়ে ঘরে আর বেশি জায়গা নেই। দাদু তো যেখানে বদলি হয়েছেন, সেখান থেকেই ডাকে পুতুল পাঠিয়েছেন। কাকলি তখন ছোট্ট, তাই মনে নেই।

সংসারে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকেও একটু দূরত্ব রেখে চলেছেন নির্মল চৌধুরী। বাবার সঙ্গে কখনও তারা অন্তরঙ্গ হয়নি। কিন্তু নাতনীর কাছেই বোধহয় তাঁকে হার মানতে হবে।

দাদুর হাত ধরে নিজের সংসারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো কাকলি। বললো, "আমার বড় ছেলে রাহুল—পোস্টাপিসের পিওন। ওর বিয়ে হয়েছে। তোমার যত চিঠি তা তো ও-ই বাড়িতে নিয়ে আসে।"

"বাঃ, বউমাটি তো বেশ ভালই হয়েছে।" দাদু গম্ভীরভাবে বললেন।

"আমি বিয়ে দিইনি, নিজেই বিয়ে করে বাড়িতে ঢুকেছে," চাপা গলায় জানিয়ে দিলো কাকলি।

আরও তিন ছেলের মা হয়েছে কাকলি। এরা কেউ বা পুলিস, কেউ মোটর সাইকেল চালায়। কী সুন্দর সাজানো সংসার।

ছোট ছেলেটি কুকুর ভালবাসে—তাই শাদা কুকুরের পাশে শুইয়ে দিয়েছে তাকে। কুকুরটা সবসময় মাথা নাড়ায়, চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে। অদিতি বললো, "মনে আছে বাবা? উলের কুকুরটা তুমি

রোম থেকে পাঠিয়েছিলে।"

দাত্থর ওপর বিরক্ত হলো কাকলি। কোথায় ছেলেদের কোলে তুলে আদর করবে, মুখ দেখে চার আনা করে পয়সা দেবে, তা না পুতুলগুলোর দিকে তাকিয়ে দাত্থ বলছেন, "বড় হলে জানতে পারবে ডলপুতুলের চোখ কেন অমন নীল হয়। রানী ভিক্টোরিয়ার নীল চোখের সম্মানে। ছোটবেলা থেকে উনি পুতুল ভালবাসতেন—ওঁর ১৩২টা পুতুল ছিল। ডলপুতুলের ব্যবসা যখন জার্মানদের হাতে চলে গেলো, তখনও ওই নীল চোখ রয়ে গেলো।"

কাকলির ছোট ছেলেটাকে বসিয়ে দিতেই সে চোখ মেলে তাকালো। কী সুন্দর চোখ! দাত্থ বললেন, "এইটটিন টোয়েন্টি-সিক্স—১৮২৬ সালের আগে পুতুলরা চোখ খুলতে বা বন্ধ করতে পারতো না।"

কাকলি জানালো, "আমার ছোট ছেলেটাই কেবল কথা বলতে পারে। আমাকে দেখলেই ইংরিজীতে 'মামি-মামি' বলে। কত বকি ওকে, বাংলায় মা বলতে বলি—কিন্তু ও কিছুতেই শোনে না।"

মা বললো, "ওই পুতুলটাও তো তুমি বন্ থেকে পাঠিয়েছিলে।"

দাত্থ কত খবর রাখে। বললো, "মিলজেল বলে এক জার্মানই তো প্রথম পুতুলকে 'মামি' বলতে শেখায়।"

কাকলির আদরের ভালুকটার কাছে এসেই পরিস্থিতি পাল্টে গেলো। মা সব জেনে-শুনে চুপচাপ ছিলেন। কাকলি বললো, "কেনিয়া-মামু এই টেডিবেয়ার এনেছিল—তখন অবশ্য ও খুব ছোট ছিল, আমি ওকে দুধ খাইয়ে বড় করেছি।"

সবাই হঠাৎ এমন চুপচাপ হয়ে গেলো কেন? কাকলি বুঝতে পারছে না। টেডিবেয়ারকে আদর করে কাকলি বললো, "দাত্থ, তুমি ওকে কোলে তুলে নিতে পারো—তোমায় কিছু বলবে না। কেমন জুল-জুল

করে তোমার দিকে তাকাচ্ছে গ্যাখো।”

দাত্থ বললো, “এই ভালুক-পুতুলের জন্ম আমেরিকায়। প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের ডাকনাম অনুযায়ী এর নাম হয় ‘টেডি’।”

দাত্থ হয়তো কাকলির কথায় টেডিকে আদর করতো—কিন্তু মা ইচ্ছে করেই দাত্থকে নিয়ে চলে গেলো।

ডলপুতুল বলতে দাত্থ এখন কাকলিকেই দেখছেন। অদিতির মেয়েটা কী মিষ্টি হয়েছে। দাত্থকে মাতাবার জন্যেই বোধহয় সকাল-বেলায় মায়ের লিপস্টিক ঠোঁটে লাগিয়েছে। মুখে রুজ লাগিয়েছে সযত্নে। দাত্থর নজর যে তার ওপর রয়েছে তা বুঝতে পারছে কাকলি। বললো, “নেল-পালিশটা যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে মা। ওটা পরলে আমাকে খুব ভাল দেখায়।”

“তোমাকে একটা আলাদা নেল-পালিশ কিনে দেবো।” দাত্থ যেভাবে তাকাচ্ছে, এখনি না ছোটগিন্নী বলে ডেকে বসে।

কিন্তু নেল-পালিশের বদলে অন্য জিনিস চায় কাকলি। “কী জিনিস বলো?” দাত্থ জিজ্ঞেস করলেন।

“কাউকে বলবে না বলো?” কাকলি এবার দাত্থকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিলো। তারপর কানে-কানে বললো, “আমার একটা মেয়ে হচ্ছে না কেন বলো তো? আমাকে একটা মেয়ে দেবে তুমি?”

এ আর এমন কী অনুরোধ। আগে জানলে বিদেশ থেকেই একটা ফুটফুটে মেয়ে-ডল আনিয়ে দিতে পারতেন। রাত্রে দাত্থর পাশে শুয়ে কাকলি আরও কাছে সরে এলো, ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে ফিস-ফিস করলো, “কেউ যেন না-জানতে পারে।

ডিপ্লোম্যাটিক চাকরিতে বহু কথাই গোপন রেখেছেন নির্মল চৌধুরী, অনেক দায়িত্ব এসেছে, কিন্তু নাতনীর মতো এইভাবে কেউ

বলেনি, "জানা-জানি হলে আড়ি আড়ি আড়ি। আমিও কেনিয়া-মামুর মতো আকাশে তারা হয়ে যাবো।"

স্টিল-ফ্রেমের চাকরিতে নিজেকে ইস্পাতের মতোই তৈরি করেছিলেন নির্মল চৌধুরী। এই প্রথম যেন তিনি হেরে যাচ্ছেন।

পরের দিন রথ। রথের মেলা-টেলা কতদিন দেখেননি নির্মল চৌধুরী। জীবনটাই তো দেশের বাইরে-বাইরে কাটালেন তিনি। মেলাতে কাকলিকে নিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু অদিতি বারণ করলো। "ভীষণ ভিড়—তোমার কোনো ধারণা নেই। হাতছাড়া হয়ে যেতে কতক্ষণ?"

যার জিনিস তার পছন্দ অনুযায়ী কেনাই ভাল। কিন্তু কাকলিকে সঙ্গে নেওয়া যাচ্ছে না। অদিতি বললো, "ওইটুকু মেয়ের আবার পছন্দ কী? ওর জন্যে তো আর বর আনছো না?"

গম্ভীর নির্মল চৌধুরী কোনো উত্তর দিলেন না। রাস্তায় বেরিয়ে মেয়ের শেষ কথাটা কানে বাজতে লাগলো। তার দুই মেয়ের বর তিনি নিজেই পছন্দ করেছেন। আর ছেলের বেলায় খোকনকে বলে-ছিলেন, তিনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ তাঁর পছন্দের একটা দাম থাকবে।

বিলেত আমেরিকায় কর্মজীবন কাটিয়ে এসে নির্মল চৌধুরী রথের মেলার প্রেমে পড়ে গেলেন। খোলা আকাশের নীচে, হাজার মানুষের ধাক্কাধাক্কি পরোয়া না করে তিনি অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন। তারপর হাতে একটা শালপাতার বাক্স নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

কাকলি ছুটতে ছুটতে এলো। ওর মা-বাবা তো ছিলেনই। দাদু বললেন, "তোমাদের মেয়ের জন্যে এক মেয়ে এনেছি।"

কাকলির আর তর সইছে না। "দাদু তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখাও। ওর নামও ঠিক করা আছে—চন্দ্রা।"

বাক্স খুলতেই ঘরের মধ্যে এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা নেমে এলো। অদিতি ভেবেছিল, বাবা কোনো মনোহারী দোকান থেকে নাতনীর জন্যে নাইলনের ডল নিয়ে আসবেন। তার বদলে রথের মেলা থেকে মাটির মেয়ে-পুতুল এনেছেন দাদু।

কী হলো? কাঁদছো কেন?"

চোখের পাতায় আঙুল ঘষতে-ঘষতে কাকলি ততক্ষণ কান্না জুড়ে দিয়েছে, "এই আমার মেয়ে! এ যে কালো কুচকুচে।"

অদিতি ও তার স্বামী লজ্জা পেয়ে গেলো। মেয়েকে দাদুর সামনে বকতে পারছে না। তবু বললো, "ছিঃ কাকলি, দাদু যা এনেছেন, তাই নিতে হয়।"

পুতুল তো পুতুল। তার রূপ নিয়ে নাতনী যে এমন কাণ্ড করবে, নির্মল চৌধুরী তা আন্দাজ করেন নি। তার ছেলেমেয়েরাও ছোটবেলায় পুতুল খেলেছে নিশ্চয়, কিন্তু তারা তো কখনও তাঁর পছন্দর ওপর কথা বলেনি।

"এ মা! কী বিশ্রী কালো। আমার মেয়ে কেন এমন কালো হবে?" এবার রীতিমতো রাগ দেখালো কাকলি।

অপরাধীর মতো নীরব থেকে নির্মল চৌধুরী দেখলেন তাঁর নাতনীর রং মেমসায়েহবদের মতো শাদা। তাঁর মেয়ে, জামাই, এমন কী তিনি নিজেও রীতিমতো ফর্সা।

অদিতিও আড়চোখে পুতুলটার দিকে তাকালো। মেয়েকে বললো, "কেন তুমি গোলমাল বাড়াচ্ছো? বেশ তো পুতুলটা।"

"বেশ তো?" ফোঁস করে উঠলো কাকলি। "তোমার মেয়ে যদি

ওরকম হতো, তাহলে তুমি নিতে?

একটু ধাক্কা খেলো অদিতি। নিজের মেয়ে ওরকম হলে সত্যি কী যে হতো! ওরকম কুরূপা মেয়ের কথা অদিতি এই মুহূর্তে ভাবতে পারছে না। পুতুলটার ঘাড় নেই, কপালটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, ট্যারা চোখ, ঠোঁট দুটোও যেন কেমন।

অদিতি মেয়েকে বকছে বটে, কিন্তু বাবাই বা দেখে-দেখে এমন পুতুল আনতে গেলেন কেন? বাজারে কি আর পুতুল ছিল না?

বাজারে অবশ্য আরও অনেক পুতুল ছিল। ঘুরে-ঘুরে দেখতে গিয়ে সুন্দরীদের ভিড়ে ওই পুতুলটার দিকেই কিন্তু নির্মল চৌধুরীর নজর পড়লো। কুরূপা পুতুলটাকে কেউ চাইছে না। দোকানদারও মাটির ওপর বেছানো সুন্দর-সুন্দর পুতুলের মেলা থেকে ওকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেছে। হুড়হুড় করে অনেক পুতুল বিক্রি হচ্ছে—কিন্তু ওর দিকে তাকিয়েই সকলে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। দোকানী গ্রামের লোক—ওই রথের মেলাতে নিজের তৈরি পুতুল বেচতে শহরে এসেছে।

নির্মল চৌধুরীর হঠাৎ মনে পড়লো খোকনকে নিয়ে একবার পুতুল কিনতে গিয়েছিলেন কেনিয়ার বাজারে। সেখানেও কুরূপা হাত ভাঙা একটা পুতুল ছিল—খোকন ওটাকেই পছন্দ করলো। বললো, "বাবা, ওকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। ওকে কেউ নিচ্ছে না।" ছোট ছেলেদের খেয়াল—ওদের মন তিনি বোঝেন না। কিন্তু তিনি বাধা দেননি। "তোমার যা পছন্দ তাই নাও।" খোকনকে বলেছিলেন তিনি।

রথের মেলায় অজস্র তালপাতার বাঁশি বাজছে। পাঁপড় ভাজার গন্ধে বাতাস মাতোয়ারা। একটু দূরে ছেলেরা নাগরদোলা চড়ছে। শত-শত লোক সওদা করছে, জিলিপ খাচ্ছে। এই ভিড়ের মধ্যে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ভাববার উপায় নেই—তবু নির্মল চৌধুরীর পুরানো

কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। খোকনটা বোধহয় ছোটবেলা থেকেই আলাদা ছিল। নইলে, বড়ো হয়ে কেউ অমন হয়ে যায়? প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত নির্মল চৌধুরীর একমাত্র ছেলে। রাজকন্যের মতো মেয়ের বাবারা তাঁকে ধরেছে ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু ছেলেটা কোথা থেকে চণ্ডীগড়ের ভাঙ্গী কলোনীর কালো কুৎসিত একটা মেয়েকে পছন্দ করে বসলো।

মেয়েটাকে খোকন একদিন বাড়িতেও এনেছিল, বাবাকে দেখাবার জন্যে। মুক্তোর মতো ছেলের গলায় সে যেন বাঁদুরে হার। আগুনের মতো জ্বলে উঠেছিলেন নির্মল চৌধুরী। ছেলেকে সোজা বলেছিলেন, ও মেয়ে বিয়ে করা চলবে না।

খোকনের সাহস কম নয়। তর্ক করেছিল, "দেখতে খারাপ হলেই বুঝি মানুষ খারাপ হয়?"

"চাকরি না করে বাবার হোটেলে থাকার সময় ওসব তর্ক মানায় না। এ-বাড়িতে থেকে ওই মেয়ে আনা চলবে না। সমাজে নির্মল চৌধুরীর একটা মান-সম্মান আছে।"

খোকন তখন কোনো উত্তর দেয়নি। বাবার মুখের ওপর কথা বলবার শিক্ষা সে পায়নি। সে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে ছিল। নির্মল চৌধুরী নিজে বিরক্তভাবে বসবার ঘর থেকে উঠে পড়ার-ঘরে চলে গিয়েছিলেন। কুরূপা সেই মেয়েটাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে খোকন স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—সে আওয়াজও নির্মল চৌধুরী শুনতে পেয়েছিলেন। তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি। রাত এগারোটা পর্যন্ত ছেলের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত পুলিসে খবর দিয়েছিলেন। আরও দু'ঘণ্টা পরে হাসপাতালের মর্গে মৃত-পুত্রের মুখ দেখতে হয়েছিল নির্মল চৌধুরীকে। লরীর সঙ্গে স্কুটারের ধাক্কা—

এই বলেই খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল। মেয়েটাকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মৃত্যু খোকনকে হাতছানি দিয়েছিল। বাবার কাছে বকুনি খেয়ে খোকন কি অন্যমনস্ক হয়েছিল? না, অন্য কিছু? দুর্ঘটনা? না আত্মহত্যা? এর সঠিক উত্তর যে দিতে পারতো সে এখন সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

রথের বাজার ঝিমিয়ে পড়েছে। এখন সন্ধ্যে আটটা। কাকলি নিশ্চয় এখনও দাদুর জন্যে জেগে বসে আছে। রথের দোকানীরা সব ট্রেনের যাত্রী—তাদের অনেকেই বিক্রির পাট চুকিয়ে ফেলেছে। ঘুরতে-ঘুরতে নির্মল চৌধুরী কী এক অজানা আকর্ষণে সেই পুতুলের দোকানে ফিরে এলেন। মিটমিট করে একটা মোমবাতি জ্বলছে। সুন্দর-সুন্দর পুতুল সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যার জন্যে ফিরে আসা, সেই কুরূপা পুতুলটা তখনও পড়ে রয়েছে। দোকানদার বুঝতে পারলো না বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় অফিসার নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে সে কথা বলছে। নির্মল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, "ওই পুতুলটাকে ওইরকম কাদার মধ্যে ফেলে রেখেছো কেন?"

"ওর যে রূপ নেই বাবু," লোকটা এক মুঠো মুড়ি খেতে-খেতে উত্তর দিলো। সারাদিন কাজ করে বেচারার খিদে পেয়েছে।

"ওই রকম 'আগলি' হলো কেন?" জিজ্ঞেস করলেন নির্মল চৌধুরী।

'আগলি' মানে যে কুৎসিত, তা বোধহয় লোকটা সহজে আন্দাজ করে নিলো। মুড়ি চিবনো বন্ধ রেখে লোকটা বললো, "হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয় হুজুর? চেষ্টা তো করি সকলকে সুন্দরী তৈরি করতে। কিন্তু যে যে-রকম ভাগ্য করে এসেছে।"

গাঁয়ের কুমোর হলে কী হয়, লোকটার কথাবার্তা তো বেশ, নির্মল

চৌধুরী ভাবলেন। কিন্তু বললেন, "যাই বলো বাপু, বড্ড বিশ্রী দেখতে।"

লোকটা ভাবলো, বাবু বোধহয় ওই সব বলে পুতুলের দাম কমাতে চাইছে। তাই বললো, "দেখতে খারাপ হলেই কি মানুষ খারাপ হয় হুজুর ? এখন ওঠবার সময়—পঁচাত্তর পয়সা পেলেই ছেড়ে দেবো।"

নির্মল চৌধুরী সমস্ত শরীরে হঠাৎ শিহরণ বোধ করলেন। খোকনের কথাগুলো হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে। ভাঙ্গী কলোনির সেই কুরূপা কালো মেয়েটার মুখ মনে করবার চেষ্টা করলেন নির্মল চৌধুরী। তারপর কাদামাখা বিরস-বদনা পুতুলটিকে তিনি আদর করে হাতে তুলে নিলেন। মোমবাতির অস্পষ্ট আলোকে পরম স্নেহে ওর মুখটিকে দেখলেন, তারপর পকেট থেকে পুরো একখানা দশটাকার নোট বার করে লোকটার হাতে দিলেন। ভাঙানি ফেরত না-নিয়ে, লোকটাকে অবাক করে দিয়ে, নির্মল চৌধুরী এবার হনহন করে মেয়ের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছিলেন।

কাকলির মতো এক ফোঁটা মেয়ে যে পুতুলের রূপ নিয়ে এমন তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে নির্মল চৌধুরী তা ভাবতে পারেন নি। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সে পুতুলটা দেখছে, আর ক্রমশ হরেক রকমের খুঁত বেরিয়ে পড়ছে। অদিতি আবার মেয়েকে বকুনি লাগালো, "ছিঃ কাকলি, দাদু যা এনেছেন তাই হাসিমুখে নিতে হয়।"

কাকলির কানে সে-কথা ঢুকলো না। সে বকুনি লাগালো, "দাদু, তোমার কোনো বুদ্ধি নেই—আমার মেয়ে এরকম দেখতে হবে কেন ?"

বাবা কিছু বলছেন না। নির্মল চৌধুরীকে নাতনী ছাড়া আর কেউ এমন বকুনি লাগাতে পারতো না। বাবা কী করে দেখেশুনে

এমন পুতুল আনলেন ?

"তুমি কি চশমা নিতে ভুলে গিয়েছিলে ?" অদিতি বাবাকে জিজ্ঞেস করলো।

চশমা যে সঙ্গেই ছিল, নির্মল চৌধুরী তা স্বীকার করলেন।

একটা পুতুলের সামান্য ব্যাপার যে ক্রমশ এতো পাকিয়ে উঠতে পারে তা আন্দাজ করা যায়নি। কাকলি বলেছিল, "এখনও সময় আছে দাত্থ, তুমি দোকানে চলে গিয়ে ওকে পাল্টে নিয়ে এসো।"

এতো রাত্রে কোথায় যাবেন দাত্থ ? তার ওপর মেলা কখন ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু কাকলি নাছোড়বান্দা।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, আগামীকাল যা-হয় হবে। কাকলি ইতিমধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখুক।

দাত্থর পাশে বিছানায় শুয়ে কাকলির আজ ঘুম আসছে না। সে ছটফট করছে। আর দাত্থ ভাবছেন, আজকালকার ছেলেমেয়েরা কতখানি নিজের মতে চলে।

"দাত্থ, তোমার কী মনে হয়, ওই মেয়ের বিয়ে হবে ?" কাকলি জিজ্ঞেস করলো।

চিন্তিত নাতনীকে দাত্থ সাহস দিলেন, "কেন হবে না ? ভগবান যাদের সুন্দর করেননি, তাদের কি বিয়ে হচ্ছে না ?"

"আমার বন্ধু আরতিকে কাল মেয়ে দেখাবো। ওর ছেলে আছে —যদি পছন্দ করে, ভাল। তাহলে ওকে ফিরিয়ে দিতে হবে না।"

কাকলি পাশ ফিরলো। তারপর গম্ভীরভাবে বললো, "আরতির ছেলেটা খুব সুন্দর—ঠিক আমার বড় ছেলের মতো। তোমার কি মনে হয়, একে পছন্দ করবে ?"

দাদুর নিজের মনেই এ-বিষয়ে যথেষ্ট ভয় রয়েছে, তবু নাতনীকে সাহস দিলেন। দাদুর ওপর আজ বেশ অভিমান হয়েছে কাকলির। নিজের ছেলেপুলে নিয়ে বেশ ছিল সে, কোত্থেকে এই কালো কুৎসিত মেয়েটাকে এনে দাদু তার ঘুম কেড়ে নিলো।

দাদুর নিজেরই এবার ঘুমের ঘোর এসোছিল। এমন সময় দেখলেন, বিছানা থেকে উঠে পড়ে কাকলি পুতুলটাকে বলছে, "খুব হয়েছে—এখন আর গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে থেকো না। তাড়াতাড়ি এই দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়ো।"

বিছানায় ফিরে এলো কাকলি। ফিস ফিস করে বললো, "জানো দাদু, হঠাৎ খেয়াল হলো কালো মেয়েটাকে শুতে বলিনি—আমার আর-সব পুতুল বিছানায় রয়েছে। উঠে গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তাই। সবাই ঘুমুচ্ছে, আর ও মুখ শুকনো করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কিচ্ছু খায়নি—ভাগ্যে দুধের গেলাশটা ছিল।"

রাগের মাথায় কাকলি আজ দুধ খায়নি—মা গেলাশটা টেবিলে রেখে চলে গিয়েছিলেন।

দাদুকে কাকলি বললো, "কী তেজ মেয়েটার। কিছুতেই দুধ খেতে চায় না। কাল দুপুরেই কিন্তু তুমি ওকে বিদেয় করে আসবে।" কাকলি সোজাসুজি জানিয়ে দিলো দাদুকে।

দাতু ও কাকলি তুজনেই আজ সকাল থেকে ভীষণ ব্যস্ত। একটু পরেই মেয়ে দেখতে আসবে আরতি।

ঘরটা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করেছে কাকলি। দাতুকে একবার বকুনি লাগালো, “শুধু বসে-বসে সিগারেট খেলেই চলবে? কিছু কাজ করবে না? তুমিই তো যত নষ্টের তোড়া।” বড্ড শক্ত কথা। ‘গোড়া’ বলতে গিয়ে কাকলি ভুলে তোড়া বলে ফেলেছে।

নির্মল চৌধুরী মনে-মনে ভাবলেন, কথাটা মন্দ বলেনি মেয়েটা। সমস্ত জীবনে অনেক ভুল করেছেন তিনি—প্রত্যেকটা ভুল যদি ফুল হয়ে যায়, তা হলে সত্যিই তিনি নষ্টের তোড়া।

সিগারেট বন্ধ রেখে নির্মল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, “কিছু করতে হবে?”

“যাও, এখনই জেনে এসো—ওদের কতজন দেখতে আসবে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো? আমি একলা হাতে আর কত পারবো?”

“কেন তোমার বউমা রয়েছে তো?” দাতু মনে করিয়ে দিলেন।

ঠোঁট বেঁকালো কাকলি। “বউমা এখনও ঘুমোচ্ছে—কোনো কথা শোনে না, কোনো কাজ করে না। ছেলেরা অফিসে চলে গিয়েছে।”

বাড়ির সবাইকে অবাক করে দিলেন নির্মল চৌধুরী। বেড়াবার

লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। চাকরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আরতিদের বাড়িটা কোথায় ?"

সকাল বেলায় বিশিষ্ট অতিথিকে বাড়ি আসতে দেখে আরতির বাবা-মা অবাক। নির্মল চৌধুরী কিন্তু কন্যা-পক্ষের প্রতিনিধির মতো বিনয়ে বিগলিত হয়ে আরতির সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। আরতি পাত্রপক্ষ, তাই কাকলির দাতুকে বিশেষ খাতির করেনি। গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিয়েছে, মেয়ে দেখতে এ-বাড়ি থেকে অন্তত তুজন যাবে, তিনজনও হতে পারে। দাদাকে বলেছে আরতি—কিন্তু আজ ফুটবল খেলা আছে স্কুলে।

বাড়ি ফিরে এসে দাতুকে সমস্ত তুপুর কাকলির সঙ্গে ব্যস্ত থাকতে হলো। এতো কাজ যে কাকলি নাওয়া-খাওয়ার সময় পাচ্ছিল না। দাতুকে ছুটতে হলো খাবার আনবার জন্যে। তারপর কালো পুতুলটাকে সাজাতে বসলো কাকলি। একে তো ওই রূপ। তার ওপর জামা-কাপড়ের যা ছিরি। দাতুকে খুব শুনিয়ে দিলো কাকলি। "জামা-কাপড়টাও দেখে নিতে পারোনি ?" নিরুপায় কাকলি নিজের একটা সিল্কের ফ্রক চুপি-চুপি ছিঁড়ে ফেললো। তারপর অনেকক্ষণ ধরে পুতুলটাকে কাপড়টা পরালো। কিন্তু ব্লাউজ ? "দাতু, তুমি চট করে একটা ব্লাউজ কিনে আনতে পারবে ?"

এইটুকু পুতুলের রেডিমেড ব্লাউজ কোথায় পাওয়া যাবে ? "মেয়ে এনেছো, আর ব্লাউজ আনতো পারোনি ?" দাতুকে আবার বকুনি লাগালো কাকলি।

কী করে কাকলি ? থাক্ এইভাবে। বউমার ঝকঝকে জরির ব্লাউজটা কিছুক্ষণের জন্যে নেবার কথা বলতে গেলেন নির্মল চৌধুরী। কিন্তু রেগে উঠলো কাকলি। "কোথাকার কোন মেয়ে, জানা নেই

শোনা নেই, তাকে বউমা কেন ব্লাউজ দেবে ?"

বকুনি খেয়ে অপরাধীর মতো চুপ করে রইলেন দাহ্। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন বেশি সময় নেই। কাকলি নিজেই এখনও তৈরি হয়নি। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মেয়েটার মখখানা তেল-চকচক করছে।

বাথরুম থেকে মুখ-হাত-পা ধুয়ে এলো কাকলি। দাহুকে হুকুম করলো, "মায়ের কাছ থেকে একটা শাড়ি নিয়ে এসো—আমি বললে মা দেবে না।"

বাবার কথা মতো অদিতিকে শাড়ি বার করে দিতে হলো। মুখ টিপে একবার হেসেই ফেললো অদিতি। নাতনীর পাল্লায় পড়ে বাবা আজ নাস্তানাবুদ হচ্ছেন—নিজেও বেশ পুতুল-খেলায় মেতে উঠেছেন। অথচ চিরকাল বাবা অন্যরকম ছিলেন—সব সময় দূরত্ব রেখে চলেছেন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে। অদিতির মনে পড়লো, নিজের মেয়ের বিয়ের সময় বাবা কিন্তু এতো কাজ করেননি। পাত্রপক্ষ যখন অদিতিকে দেখতে এলো, বাবা তখন অফিসের কোন এক জরুরী কাজে সাউথ ব্লক অফিসে চলে গেছেন।

শাড়ি পরে কাকলি এবার গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, "দাহু, কেমন দেখাচ্ছে ?"

"ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে। যে-দেখবে সেই পছন্দ করবে—" দাহুর এই উত্তরে ভীষণ রেগে উঠলো কাকলি। "আমাকে নয়—এই মেয়েটার কথা হচ্ছে।"

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পুতুলকে দেখলেন নির্মল চৌধুরী। একদিনে মেয়েটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে অনেকখানি সুন্দর করে ফেলেছে কাকলি।

"ঠোঁটে একটু লিপেস্টিক দেবো ?" কাকলি এবার দাহুর পরামর্শ চায়।

"দাও," সুচিন্তিত অভিমত দেন অনভিজ্ঞ নির্মল চৌধুরী। "মায়ের কাছ থেকে লিপস্টিকটা নিয়ে এসো," বললেন তিনি।

"তোমার কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই," আবার বকুনি লাগালো কাকলি। "মায়ের লিপেস্টিক টকটকে লাল—ফ্লেমিংগো রেড্। কালো মেয়ের জন্যে চাই ন্যাচারাল কালার।" একটুকু মেয়ে এরই মধ্যে রংয়ের নামটাম রপ্ত করে ফেলেছে।

দাদু দোকানে ছুটলেন লিপস্টিক কিনতে। দোকান থেকে ফিরেই দেখলেন নাতনীর রাগ আবার বাড়ছে। গম্ভীর মুখে কাকলি বললো, "আরতি যদি পছন্দ না করে, আজকেই তুমি ওকে দোকানে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।"

বাইরে বেল বাজলো। দরজা খুলে নির্মল চৌধুরী দেখলেন পাত্রপক্ষ এসে গিয়েছে, মায়ের শাড়ি পরে গম্ভীরমুখে দরজার কাছে আরতি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"তিনজনের জায়গায় মাত্র একজন?" জিজ্ঞেস করলেন নির্মল চৌধুরী।

গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসতে-বসতে আরতি বললো, "একজন কই? দুজন এসেছি আমরা। ভুলু এসেছে।" ছোট্ট একটা কুকুর আরতির পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে। "দাদার খেলা শেষ হয়নি, তাই এলো না।"

আরতি আজ অন্যদিনের তুলনায় গম্ভীর। একটু যেন দূরত্ব রেখে চলছে সে।

কন্যাপক্ষের সঙ্গে বেশি মাখামাখি ভাল নয়। আরতি বললো, "ভুলু, তুমি চুপচাপ বোসো। এখনই মেয়ে দেখবে।"

ভুলু এবার গম্ভীর হয়ে সোফার ওপর উঠে বসে পড়লো। অন্যদিন হলে ভুলুকে ওখানে বসতে দিতো না কাকলি। নখ দিয়ে সোফার

কাপড় ছিঁড়ে দেয় ও। আজ কিন্তু ভুলুকে কুটুমের মতো খাতির করতে হলো।

কাকলি ফিসফিস করে দাছুকে বললো, "ভুলুটার খুব বুদ্ধি—তাই আরতি ওকে মেয়ে দেখতে এনেছে। কিন্তু ওকে কী খাওয়াবো? তুমি তো কেবল সিঙাড়া আর রাজভোগ এনেছো।"

ডিশে করে খাবার সাজিয়ে আরতির সামনে রাখলো কাকলি দাছু বললেন, "একটু মিষ্টিমুখ হোক মেয়ে দেখার আগে।"

খাবার দেখে ভুলু চঞ্চল হয়ে উঠেছে—সে আর ভব্যতা বজায় রাখতে পারছে না।

খুব লজ্জা পেয়ে কাকলি বললো, "ওকে কী দিই? একটু ছুধ?"

আরতি গম্ভীরভাবে বললো, "সিঙাড়াটা ওর সহ্য হয় না—তবে রাজভোগ খেতে ভুলু খুব ভালবাসে।"

ভুলু কথাবার্তা সব বুঝতে পারছে। খাবারের আনন্দে তার জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

ছুধ ও রাজভোগ শেষ করে ভুলু ছটফট করছে। ঘনঘন ল্যাজ নাড়ছে। আরতি বললো, "মেয়ে দেখার জন্যে ও ব্যস্ত হয়ে পড়ছে।" ভুলুর গায়ে হাত দিয়ে আরতি বললো, "ছিঃ ভুলু, ওরকম করতে নেই, আমি চা খেয়ে নিই—তারপর মেয়ে আসবে।"

বন্ধুকে আরতি বললো, "তুই যদি পারিস, ভুলুকেও একটু চা দিস—বাড়িতে আমরা ছুজনেই তো চা পাই না।"

নির্মল চৌধুরী অবাক হয়ে ছোট মেয়েদের এই বড় জগৎ দেখছেন। কাকলি বললো, "ছেলে কতদূর পড়েছে?"

"বি-এ ফেল," আরতি গম্ভীরভাবে বললো। ওর কাকুও এবার বি-এর পরীক্ষায় ফেল করেছে।

মেয়ের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর করলো আরতি। বেশ লজ্জা পেয়ে গেলো কাকলি—দাদুর মুখের দিকে সে তাকালো। দাদু আমতা-আমতা করতে লাগলেন। কাকলি বললো, "গাঁয়ের মেয়ে তো—লেখাপড়া একদম জানে না।"

আরতি বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। কালো পুতুলকে এবার দুরু দুরু বুকে কাকলি ওদের সামনে এনে বসিয়ে দিলো।

একেবারে নীরবতা—কেউ কোনো কথা বলছে না। প্রায় দু-তিন মিনিট ধরে আরতি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে পুতুলটাকে। তার মুখ দেখে মনের অবস্থা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ভুলুটাও সব খুঁটিয়ে দেখছে—একবার ছুটে এসে পুতুলটাকে শুঁকলো। জিভ বার করে চেটেও দিতো, যদি না আরতি বকুনি লাগাতো। ভুলুর খুব আনন্দ —ওর বোধহয় মেয়ে পছন্দ হয়েছে।

আরতি এসব কথাবার্তা কোথা থেকে শিখেছে ভগবান জানেন। বললো, "পায়ের পাতা দুটো দেখি—কাপড়ে ঢাকা রয়েছে।"

কাকলি অন্য সময় আরতি কথা শোনে না। আজ কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পায়ের কাপড় তুলে পুতুলের পা দেখিয়ে দিলো।

"রান্না-বান্না?" আরতি জিজ্ঞেস করলো।

কাকলি আবার দাদুর দিকে আড়চোখে তাকালো। "গাঁয়ের মেয়ে তো—রান্না ভালই জানে।" দাদু নিজেই উত্তর নিলেন।

পনেরো মিনিট পরে ছেলের মা ভুলুর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। কাকলি যথাসাধ্য ভদ্রতা দেখিয়েছিল। ভুলু একটা কাপ ভেঙে ফেললো, তবু কাকলি কিছু বলেনি। আরতিকে আড়ালে ডেকে কাকলি লোভ দেখিয়েছে, মেয়ে পছন্দ হলে, দাদু দু'খানা ক্যাডবেরি কিনে দেবেন।

কিন্তু আরতি নরম হবার মেয়ে নয়। সোজা বলেছে, "শুধু চকোলেট খেলেই হবে না—নিজের পেটের ছেলের কথাও ভাবতে হবে।"

দাদুর কোলে কালো পুতুলকে বসিয়ে দিয়ে কাকলিও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। দাদু বসে ছটফট করছেন। এই নাটকে তিনি নিজে বেশ জড়িয়ে পড়েছেন।

ঠোঁট ফুলিয়ে কাকলি বাড়ি ফিরলো। এসেই দাদুর কোলে মুখ লুকিয়ে বললো, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। ওকে এখনই বিদেয় করে দিয়ে এসো।" আরতির মেয়ে পছন্দ হয়নি। এমন কী ভুলুটাও আরতির পক্ষে!

পুতুলটা এনে নির্মল চৌধুরী যে কী বিপদেই পড়লেন! এখন ওকে কে ফেরত নেবে? সত্যি কথা বলতে, বেচারাকে ফেরত দেবার কোনো ইচ্ছেই ছিল না তাঁর। এক কালো মেয়েকে ফেরত দিয়ে তিনি জীবনের শিক্ষা পেয়ে গিয়েছেন। খোকনটা কি যে করলো। এখন তাঁর নিজের কোনো পছন্দ অপছন্দ নেই।

বেশ কয়েকবার কাকলি হুকুম করেছে, "যাও ওকে রেখে এসো। রাত হয়ে যাচ্ছে।"

নির্মল চৌধুরী তবু চুপচাপ বসে আছেন। ভাবছেন, আর একটা দিন সময় ভিক্ষা করে নেবেন নাতনীর কাছ থেকে। কুরূপা পুতুলটাকে নিয়ে এসে এবাড়ির মেয়েটার জীবনেও তিনি অশান্তি ডেকে এনেছেন।

বন্ধুর কাছে অপমানিত হয়ে, কাকলি এখন পুতুলটার মুখ দেখতে চাইছে না। রেগে বলেছে, "সত্যিই তো, এই রকম বেঁটে মোটা কালো বোঁচা ট্যারা বিশ্রী মেয়ে কার পছন্দ হয়?"

বাড়ির চাকর অভয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দাদুর অসহায় অবস্থা দেখছে। এক সময় সে ফিসফিস করে বললো, "আপনি ব্যস্ত হবেন না দাদু। দরকার হলে যা-ব্যবস্থা করার আমিই করবো।"

অভয়ের কথা দাদুর মোটেই মনঃপূত হলো না। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। ব্যবস্থা যা নেবার তা তো তাঁরই নেওয়ার কথা।

সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসেছিল কাকলি। পড়া শেষ করে খেলাঘরে গিয়েই সে চমকে উঠলো। কালো পুতুলটা নেই। কাকলির অন্য পুতুলগুলো সব যে যার জায়গায় রয়েছে, উধাও হয়েছে কেবল কালো পুতুলটা।

ছেলেদের জিজ্ঞেস করলো কাকলি, "তোরা দেখেছিস ? মেয়েটা কোথায় গেলো ?"

ছেলেরা সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

"বউমা, বউমা, তুমি তো সারাক্ষণ বাড়ি রয়েছো। তুমি নিশ্চয় দেখেছো, মেয়েটা কোথায় গেলো ?" কাকলি কাতরভাবে জিজ্ঞেস করলো।

জমকালো শাড়ি পরা এবং রুজমাখা বউমা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। কোনো কথা বললো না।

কাকলির উত্তেজনা বাড়লো। পড়তে যাবার আগেও তো মেয়েটাকে দেখেছে সে। এর মধ্যে কোথায় উধাও হলো ?

"ভালুক ভাই, ভালুক ভাই, তুমি জানো ?" কাকলি এবার কাঁদো-কাঁদো অবস্থায় জিজ্ঞেস করলো।

টেডিবেয়ারের চোখ দুটো অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে। তার চোখ ছলছল করছে। মনে হচ্ছে সে বলছে, "যাকে তুমি এতো

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছো, তার আর খোঁজ নিয়ে লাভ কী ?"

বিলিতী কুকুরটাও এতোক্ষণ চুপ করে বসেছিল। তাকে একটু ধাক্কা দিতেই সে অভ্যাসমতো মাথা নাড়তে শুরু করলো। কাঁদো-কাঁদো হয়ে কাকলি জিজ্ঞেস করলো, "বলতে পারো, কোথায় গেলো কালো পুতুল ?"

গম্ভীর মুখে কুকুর কেবল মাথা নাড়তে লাগলো। কোনো উত্তর দিলো না।

অজানা ভয়ে গা ছম-ছম করছে কাকলির। হাঁপাতে-হাঁপাতে দাদুর কাছে এসে হাজির হলো কাকলি। "দাদু তুমি কি সত্যই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে এলে ?" ছলছল করছে কাকলির চোখ। "আমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল একবার, বিকেলে বেচারা কিছু খায়নি। ওকে খাবার দিতে ভুলে গিয়েছি। আমার অন্য ছেলেমেয়েরা খাবার না পেলে চেঁচামেচি করে—ও চুপ করে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। ভীষণ অভিমান ওর।"

দাদু প্রথমে থতমত খেলেন। ভাবছিলেন, ওকে ফিরিয়ে না-দিয়ে আসার জন্যেই নাতনীর কাছে বকুনি খাবেন।

বাড়ির প্রতিটা জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেললো কাকলি। রাগ করে মেয়েটা কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে ? খাটের তলা, বাক্সের পিছন দিক, আলমারির কোণ—সব ভাল করে খুঁজলো কাকলি। মা তাকে খেতে ডাকছেন, কিন্তু খাওয়া মাথায় উঠছে কাকলির।

রাত্রে খেতেই চাইছিল না কাকলি। মার বকুনিতে একখানা রুটি খেয়ে সে উঠে পড়লো। একটু পরে তাও বমি হয়ে গেলো।

"দাদু, দাদু, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?" মাঝরাতে কাকলির

ডাক শুনে নির্মল চৌধুরী বুঝলেন মেয়েটা ঘুমোয়নি।

কাকলির কথায় দাছুকে উঠতে হলো। ছুজনে মিলে আবার খোঁজাখুঁজি চললো। পুতুলের সংসারে সবাই শান্তভাবে শুয়ে রয়েছে, শুধু ভালুকটা ছাড়া—ও বেচারা চোখ বন্ধ করতে পারে না, তাই ওর ঘুম আসে না।

অনেক কষ্টে নাতনীকে এনে বিছানায় শোয়ালেন নির্মল চৌধুরী। বললেন, "কাল সকালে আবার খোঁজ করা যাবে।"

কাকলি এখনও ছটফট করছে। "দাছু, কেউ হারালে পুলিসে খবর দেয় না? তুমি একবার থানায় ফোন করে দাও।"

দাছুর মনে পড়লো, খোকন সে-রাত্রে বাড়ি না ফেরায় এমনি অস্থিরভাবে তিনি পুলিসের খোঁজ করেছিলেন।

এখন নাতনীকে সামলাবার জন্যে বললেন, "পুলিসরা এখন ঘুমোচ্ছে, লক্ষ্মীসোনা। কাল সকালে যা-হয় হবে।"

নির্মল চৌধুরী পাশ ফিরে শুলেন। আজ রাত্রে তাঁরও ঘুম না-আসার কথা। আগামীকাল ১০ই জুলাই। ছু'বছর আগে আজ রাত্রেই খোকন শেষবারের মতো তাঁর পাশের খাটে ঘুমিয়েছিল। একা ঘুমোতে ভয় পেতো খোকন। মা-মরা ছেলে, তাই কিছু বলতেন না নির্মল চৌধুরী।

কাকলি এবার ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে। আর নির্মল চৌধুরী ১০ই জুলাই-এর সেই ভয়ানক রাত্রির কথা ভাবলেন—খোকন বাড়ি ফেরেনি।

"দাছু, দাছু," কাকলি আবার ডাকছে। "এইমাত্র একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম। দাছু, এখন একবার ছাদে যাবে?"

এই গভীর রাতে ছাদে যাওয়া! কিন্তু দাছু কেন জানি না রাজী

হয়ে গেলেন। আলো জ্বেলে, পা টিপে-টিপে ওরা দুজন ছাদে উঠে এলো! "আকাশে আজ অনেক তারা। তারারা কেউ এখনও ঘুমোতে যায় নি।" দাদু শান্তভাবে বললেন।

কাকলি বললো, "ঘুমোতে যাবে কী করে? এই সময় তো ওরা অপেক্ষা করে, নিজেদের লোকদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।"

আকাশের দিকে তাকিয়ে অধীর আগ্রহে কাকলি কী যেন খুঁজছে। সে বললো, "দাদু, দ্যাখো তো কালকের থেকে আজ আকাশে একটা তারা বেশি আছে কিনা?"

এ আবার কী অদ্ভুত খেয়াল। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি এই তারা গোনা কি তাঁর মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? কাকলি বললো, "তুমি কিচ্ছু জানো না, দাদু। কেউ মরে গেলে সে আকাশের তারা হয়ে যায়। আমি হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম, মেয়েটা গাড়ি চাপা পড়েছে।"

নাতনীকে অভয় দিলেন নির্মল চৌধুরী। তারপর আকাশের তারাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, দুজনে নীচে একতলায় এলেন।

নাতনীর পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে নির্মল চৌধুরী ভাবছেন, কাকলি যেন আর ছোট্ট মেয়েটি নেই।

পরের দিন কাকলি ইস্কুলে যেতে চাইছে না। খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছে। এই একদিনেই বেচারার চোখের কোণে কালি পড়েছে।

কাকলির মা ও বাবা মেয়ের ওপর বিরক্ত। সামান্য একটা পুতুল, যাকে পছন্দ হচ্ছিল না, তার জন্যে এই রকম কাণ্ড বাধাবার মানে হয় না। দাদু কিন্তু ওদের বাধা দিলেন।

সকাল থেকেই আজ কাকলির চোখে জল। সমস্ত জায়গা খুঁজে-

খুঁজে সে এখন আশা ছেড়ে দিয়েছে। চোখ বুজছে কাকলি মাঝে-মাঝে, আর সঙ্গে-সঙ্গে পুতুলটার অসহায় মুখটা সে দেখতে পাচ্ছে।

বেলা সাড়ে-দশটা। স্নানের ঘরে গিয়ে, দরজা বন্ধ করে শাওয়ার খুলে দিয়ে নির্মল চৌধুরী একটু কেঁদে নিচ্ছিলেন। ১০ই জুলাই সবার অলক্ষ্যে চোখের জল ফেলে তিনি নিজেকে একটু হাল্কা করে নেন। তারপর তিনি বেরোবেন মেয়েদের জন্যে কেক কিনতে। এই কেক জিনিসটা খোকনের খুব প্রিয় ছিল।

নির্মল চৌধুরী তাঁর মনের বাঁধ খুলে দিয়েছেন—বড়-বড় অশ্রুর ফোঁটা আষাঢ়ের বৃষ্টির মতো তাঁর মনের মাটিতে পড়তে শুরু করেছে। ঠিক সেই সময়, কাকলির উত্তেজিত গলার স্বর শোনা গেলো—"দাদু, দাদু!"

নির্মল চৌধুরী ভিজে কাপড়ে কলঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন। কাকলির প্রবল উত্তেজনা। কালো পুতুলকে পাওয়া গিয়েছে। বুড়ী জমাদারনী বাড়ির ডাস্টবিন সাফাই করতে এসে জঞ্জালের মধ্যে রঙিন কাপড়-পরা পুতুলটাকে দেখতে পেয়েছে।

মাছের কাঁটা, এঁটো, ছাইকাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে পুতুলটা এখনও পড়ে রয়েছে। কাকলি কারও কথা শুনলো না, পাগলের মতো ছুটে গিয়ে জঞ্জালের ভেতর থেকে দু'হাতে ওকে তুলে আনলো। মা হা-হা করে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত নোংরা সমেত পুতুলটাকে নিজের বুকের কাছে চেপে ধরেছে কাকলি। নিজের পরিষ্কার জামাকাপড়ে ডাস্টবিনের জঞ্জাল লাগছে, সে-খেয়াল নেই।

"ছাখো ছাখো, আমার মিষ্টি সোনার কী অবস্থা হয়েছে!" পুতুলকে কাকলি তার বুকের কাছে আরও জোরে চেপে ধরেছে। সমস্ত রাত জলে ভিজে পুতুলটার রং অনেকখানি উঠে গিয়েছে। ইঁদুর

বোধহয় একটা হাতের কিছুটা কেটে দিয়েছে। বিবর্ণ পুতুলটাকে আরও বিশ্রী দেখাচ্ছে।

কিন্তু কাকলিকে সে-কথা এখন কে বলবে? "খুকু আমার ঘরে চলো—তোমাকে আমি আর কক্ষনো বকবো না। তুমি আমার মিষ্টি মেয়ে, সোনা মেয়ে, আমার নিজের মেয়ে," এই বলে কাকলি বিবর্ণ নোংরা পুতুলটার মুখে, চোখে, কপালে একের পর এক চুমু খেতে লাগলো।

রেগে-মেগে অদিতি এবার কাকলিকে মারতে যাচ্ছিলো। "ডাস্টবিনের নোংরা মুখে দিয়ে তুই যে অসুখে পড়ে যাবি।"

দাদু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। এমন অদ্ভুত দৃশ্য তিনি জীবনে কখনও দেখেননি। নিজের মেয়েকে বাধা দিয়ে, মনের অনুভূতি চেপে রেখে নির্মল চৌধুরী কোনোরকমে বললেন, "ও যে মা-জননী—হারানিধি খুঁজে পেয়েছে। ওকে তোমরা কিছু বোলো না।"

দাদু আর-একবার ঘাড় ফিরিয়ে কাকলি ও তার কালো মেয়েকে দেখলেন। তারপর স্নানের ঘরে ফিরে গিয়ে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

আশ্চর্য মানুষ

ছোটবেলায় আমি যে-ইস্কুলে পড়তাম তার নাম বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন। হাওড়ার নেতাজী সুভাষ রোডে এই ইস্কুলের সেকেলে ধরনের তিন তলা বাড়িটা এখনও ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও আমাদের ইস্কুল ওখান থেকে কয়েক বছর আগে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে।

বিবেকানন্দ ইস্কুলেই আমার থেকে কয়েক বছরের সিনিয়র ছিলেন লক্ষ্মীমাধব মণ্ডল। সবাই আমরা তাঁকে ডাকতাম ছেনোদা বলে।

ছেনোদাকে দূর থেকে ইস্কুলে দেখতাম আর ভাবতাম, হায়রে, যদি আমি কোনোরকমে ছেনোদার মতো হতে পারতাম!

ছেনোদা তখন সবার হিরো। কারণ স্পোর্টসে তাঁর জুড়ি নেই। হাইজাম্পে ফার্স্ট হয়েছিলেন ছেনোদা। চারশো চল্লিশ গজ এবং দুশো কুড়ি গজ দৌড়েও ফার্স্ট প্রাইজ অন্য কারুর নিয়ে যাবার উপায় নেই। চার মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতাতেও সেবার হাওড়া জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে ছেনোদা রূপোর চ্যালেঞ্জ কাপ পেয়েছিলেন—এতো বড় কাপ যে ছেনোদা একা বয়ে আনতে পারছিলেন না।

খেলাধূলা কোন দেবতার অধীনে জানি না। ছেনোদার উপর তিনি সন্তুষ্ট হওয়ায় দেবী সরস্বতীর মন বিগড়ে গেলো। বিবেকানন্দ ইস্কুলের ক্লাশ সেভেনের জংশন স্টেশনে এসে ছেনোদার বিদ্যের ইঞ্জিন

সেই যে থামলো আর নড়লো না।

তিন বছর পর-পর ফেল করলেন ছেনোদা। শেষবারে পরীক্ষার সময় কোমরে কাগজ মুড়ে এনেছিলেন ছেনোদা। কিন্তু আমাদের হেডমাস্টার মশায়ের চোখ একটি রাডার যন্ত্র বিশেষ। টুকতে গিয়ে তাঁরই হাতে ছেনোদা ধরা পড়ে গেলেন। প্রথমে পরীক্ষার হল্‌ থেকে এবং সময়মতো ইস্কুল থেকেও তাঁকে বিদায় নিতে হলো।

তারপর যা হয়ে থাকে তাই হলো। ছেনোদা বয়ে গেলেন। কোঁড়ারবাগানে একটা নোংরা চায়ের দোকানে বসে তিনি বিড়ি খেতেন। সেই দোকানে গালাগালি মারামারিও চলতো।

খবর পেয়েছি, ঐ বয়সে ছেনোদা নাকি গাঁজাও ধরেছিলেন। ইস্কুল যাবার পথে চায়ের দোকানের সামনে ছেনোদার সঙ্গে মাঝে-মাঝে আমার দেখা হয়ে যেতো। আমাকে তিনি ডেকেছেন—“এই শোন।”

আমরা বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের ভাল ছাত্র। ঐরকম বিড়ি-খাওয়া ছেলের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে লজ্জায় মাথা কাটা যেতো।

ছেনোদা অবশ্য খুব ভাল ব্যবহার করতেন। বলতেন: “মাস্টার-মশায়রা সব ভাল আছেন তো? এবার চার মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় কে ফার্স্ট হলো?”

ছেনোদা জানতেন আমি ভাল ছেলে। তাই কোনো গালাগালি করতেন না। তবু আমার ভয় হতো, কেউ যদি দেখে ফেলে। ভাববে, আমি খারাপ হয়ে গিয়েছি, না-হয় উচ্ছন্নে যাবার পথে পা বাড়িয়েছি।

এরপর ছেনোদা আমাকে বিশেষ ডাকতেন না। হয়তো আমার ভাবভঙ্গীতে মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ

আমাকে তিনি ডেকে বসলেন। রাস্তার দোকানে নোংরা হাফ্-প্যান্ট পরে ছেনোদা বিড়ি টানছিলেন। দূর থেকে আমাকে দেখেই ডাকলেন, "এই শোন।"

সেবার ইস্কুল ম্যাগাজিনে আমার একটা লেখা বেরিয়েছিল। ছেনোদা বেশ কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁরে, তুই গল্প লিখিস?"

আমি গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লাম। ছেনোদার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। প্রশ্ন করেছিলেন, "কী করে গল্প লিখিস রে?"

ভারিক্কী চালে উত্তর দিয়েছিলাম, "বানিয়ে।"

ছেনোদা আরও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। "মাথার মধ্যে বুঝি গল্প এসে যায়? আচ্ছা, রবিঠাকুরও তো ঐভাবেই লিখতেন?" ছেনোদা জানতে চেয়েছিলেন।

আমি বিজ্ঞের মতো মৃদু হেসে সায় দিয়েছিলাম এবং এমন একটা ভাব দেখিয়োছলাম যে ছেনোদার বুঝতে কষ্ট হয়নি, আমি ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই লেখক, এবং আমরা দুজনেই মাথা খাটিয়ে লিখি। আর সেইজন্যেই বোধহয় ছেনোদা তখন থেকেই আমার সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা করে বসেছিলেন। দেখা হলেই কথা বলতে চাইতেন। আবার কখনও নিজেই সাবধান করে দিতেন, "আমাদের সঙ্গে মিশবি না— আমাদের রেকর্ড খারাপ। দিনরাত পড়াশুনা নিয়ে থাকবি, আর মাথা খাটিয়ে লিখে যাবি।"

এই ভাবে হয়তো আরও অনেক দিন চলতো। কিন্তু ছেনোদা হঠাৎ অন্য কোথাও উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। আর আমিও আগ্রহ করে তেমন খোঁজ নিইনি, বরং তাঁর হাত থেকে বাঁচতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস নিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে ইস্কুল ম্যাগাজিনে আমার আরও লেখা

বেরিয়েছে ; ভাল ছেলে বলে আমার সুনাম আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সৌভাগ্যের জোয়ারে অবাঞ্ছিত ছেনোদা আমার কাছ থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছেন।

কিন্তু অনেকদিন পরে ছেনোদাকে আবার আমার প্রয়োজন হলো। আমার বাবা তখন অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মফঃস্বল আদালতের উকিল, দৈনন্দিন অন্নবস্ত্র যোগাড়ের সংগ্রামেই ব্যস্ত থাকতেন, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করবার সুযোগ পাননি। আমার তখন বড়ই দুর্দিন। পয়সার অভাবে পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরির উমেদারি করে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু কোথায় চাকরি? শুনেছিলাম টাকা ফেললে কলকাতা শহরে বাঘের দুধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। তাই বাবার দেওয়া ছোট-বেলাকার সোনার আংটি এবং বোতাম বিক্রি করে কিছু কাঁচা টাকাও যোগাড় করে রেখেছিলাম। একশো টাকা সেলামী দিয়ে আমার এক নিকট আত্মীয় এক সরকারী প্রতিষ্ঠানে লোয়ার ডিভিশন কেরাণীর চাকরি পেয়েছিলেন। আমাকে সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন, "ক্যাশ যোগাড় রেখো। কখন সুযোগ এসে যাবে, তখন টাকা না থাকলে সারা জন্ম আফসোস করে মরবে।" আমার টাকা রেডি, কিন্তু কোথায় চাকরি?

শেষে টাইপ শিখতে আরম্ভ করলাম। কত তাড়াতাড়ি ঐ বিদ্যেটা রপ্ত করা যায় এই চেষ্টা। কিন্তু সেখানেও বাধা। টাইপ ইস্কুলের মালিক ভবতারণবাবু খালি গায়ে, ঘড়ি হাতে শিকারী কুকুরের মতো মেশিন পাহারা দিতেন। শেখাবার জন্যে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ; তিনি কেবল নজর রাখতেন কেউ আধঘণ্টার বেশি টাইপ করছে কিনা।

আধঘণ্টাও তিনি ধৈর্য ধরে বসতে পারেন না। পঁচিশ মিনিট হলেই চিৎকার করে বলতেন, "রেমিংটন তিন নম্বর, ফাইভ মিনিট্‌স মোর।" পাছে কেউ বেশি শিখে ফেলে, তাড়াতাড়ি ইস্কুল ছেড়ে দেয়, সেই জন্যেই কড়া নজর।

এক-একজন ছাত্র নাছোড়বান্দা ছিল। জোর করে চেয়ার থেকে তুলে না-দেওয়া পর্যন্ত তারা টাইপ করে যেতো। ভবতারণবাবু মুখ বেঁকিয়ে ব্যঙ্গ করতেন, "এই আগ্রহটা ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় দেখালেই পারতে! স্কলারশিপ পেয়ে আই-এ-এস, বি-সি-এস হতে পারতে—এই বাক্স-বাজানোর লাইনে আসতে হতো না।"

এর মধ্যেই লোকজনকে বলেছি, "টাইপিস্টের চাকরির খবর পেলে একটু দেখবেন। আমার চল্লিশ স্পিড হয়েছে।"

স্পিডের বহর শুনে কেউ-কেউ আঁতকে উঠেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে শুনিয়ে দিয়েছেন, "সে রামরাজত্ব আর নেই ভায়া। চল্লিশ স্পিডে মেমসায়েবরা ছাড়া আর কেউ চাকরি পায় না। আমাদের অফিসে আয়ার ছোকরা তো হাসতে-হাসতে পঁচাত্তর স্পিডে টাইপ করে। ছোকরা বিকেল পাঁচটার পর একঘণ্টা এক্সট্রা প্র্যাকটিশ করে—একশো স্পিড হলো বলে!"

দু-চার জন তো আমাকে দেখলেই অন্য দিক দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতেন। ভাবতেন, এখনই হয়তো চাকরির জন্যে ঘ্যানর-ঘ্যানর আরম্ভ করবো।

রাস্তায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে একটা ধনদা কবচ কিনবো কিনা। বিজ্ঞাপনে লিখেছে : বেকারের নিশ্চিত চাকরিপ্রাপ্তি! তবে দ্রুত ফল পেতে হলে আণবিক শক্তিসম্পন্ন ধনদা এক্সট্রা স্ট্রং কবচ। দাম কিন্তু অনেক বেশি—১৭২ টাকা। অত টাকা

আমি কোথায় পাবো ?

এমন সময় একদিন আমাদের গলির মোড়ে ছেনোদাকে দেখতে পেলাম। সাদা হাফ্-সার্ট, খাকী হাফ্-প্যান্ট, কালো জুতো আর সবুজ মোজা পরে ছেনোদা চলেছেন। হাতে একটা কালো রংয়ের চৌকো চামড়ার ব্যাগ।

আমাকে দেখেই ছেনোদা থেমে গেলেন। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, নতুন গল্প কী লিখলি ?"

বললাম, "কিছুই লিখিনি।"

কিন্তু আমার উত্তরে ছেনোদা নিরাশ হলেন না। বললেন, "রবিঠাকুরও তো মাঝে-মাঝে কিছু না লিখে চুপচাপ বসে থাকতেন। কবি, শিল্পী, লেখকদের ঐ মুশকিল। কখন সরস্বতী দয়া করবেন তার জন্যে বুড়ো আঙুলটি মুখে গুঁজে চুপচাপ বসে থাকো। আমাদের কিন্তু ওসব নেই। যখন ক্ষিদে পাবে তখন ঠিক যেমন করেই হোক টাকা কামিয়ে পেট ভরাবো।"

কথার উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ছেনোদার কালো ব্যাগটার উপর নজর পড়ল। ওখানে সাদা রং দিয়ে লেখা—'গ্রেট ইণ্ডিয়ান টাইপরাইটার লিমিটেড'।

ছেনোদা চলে যাচ্ছিলেন। আমি হঠাৎ ডাকলাম, "ছেনোদা।"

চমকে পিছনে তাকিয়ে ছেনোদা আমার কাছে ফিরে এলেন। উত্তেজনায় আমার তখন ঠোঁট কাঁপতে আরম্ভ করেছে। এতোদিন তবু ভদ্রলোকের কাছে চাকরির জন্য বলেছি। এবার বস্তির লোকদেরও ধরতে হবে! ছেনোদা জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে ডাকছিস ? কিছু বলবি ?"

"ছেনোদা, আপনি টাইপের কাজ করেন ?"

"হ্যাঁ, আমি তো টাইপ মেশিনের মেকানিক।"

লজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, "আমি টাইপ করতে শিখেছি ছেনোদা।"

ছেনোদা যেন চমকে উঠলেন। চিন্তিত মুখে বললেন, "তুই কেন এ লাইনে আসবি? রবিঠাকুর কি টাইপ করতেন?"

আমি উত্তর দিতে পারিনি। চোখ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ করেছে।

ছেনোদা বুঝতে পারলেন। চাকরি না হলে আমাকে যে না খেতে পেয়ে মরতে হবে, তাও বুঝলেন। পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললেন, "ঘাবড়াস না, আমি তোর চাকরি করে দেবো। কত জায়গাতেই তো মেশিন সারাতে যাই।"

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের দুজনের আবার দেখা হয়েছে। ছেনোদা চায়ের দোকানে বসে ফুটবলের আলোচনা করছিলেন। আমাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে ডাকলেন। বললেন, "চা বিস্কুট খা।"

লজ্জা পেয়ে বলেছি, "এসব কেন ছেনোদা? আমার চাকরির চেষ্টা করছেন এই যথেষ্ট।"

ছেনোদা বলেছেন, "খেয়ে নে। না খেলে গল্প লেখার মাথা খুলবে না। ভাল ছেলেদের মগজ সাফ রাখার জন্যে কত কি খাওয়া দরকার। তা তোর চাকরির জন্য বহু জায়গায় বলে রেখেছি। তুই বরং কাল থেকে আমার সঙ্গে বেরো: আমি নিজেই তোকে চেনাশোনা পার্টিদের কাছে নিয়ে যাবো।"

পরের দিন সকালে আমার নতুন জীবন শুরু হলো। ৯৫ নম্বর কোঁড়ারবাগান লেনে হিন্দুস্থানী বস্তির একটা অন্ধকার ঘরে ছেনোদা

থাকেন। ছেনোদার ভিজিটিং কার্ডখানার দিকে নজর পড়লো—

গ্রেট ইণ্ডিয়ান টাইপরাইটার লিমিটেড

ফ্যাকটরি অ্যাণ্ড হেড অফিস :

৯৫ কোঁড়ারবাগান লেন, হাওড়া

সিটি অফিস :

১৬৭ সোয়ালো লেন, কলকাতা

ফোন :

ছেনোদা আমার ভাব দেখে হেসে ফেললেন। নিজের ব্যাগটা দেখিয়ে বললেন, "অফিসের নামটা দেখে ঘাবড়ে যাস না। আসলে এই ব্যাগটাই আমার ফ্যাকটরি! এইটাই আমার সিটি অফিস, এইটাই আমার হেড অফিস! ভিজিটিং কার্ড না-থাকলে পার্টি বিগড়ে যায়, ভাবে বাজে লোক।"

বাস এবং ট্রামে চড়ে আমরা যখন কলকাতার অফিস পাড়ায় হাজির হলাম, তখন প্রায় বেলা এগারোটা। কিন্তু কোথায় গ্রেট ইণ্ডিয়ান টাইপরাইটার কোম্পানি? একটা পুরানো টাইপরাইটারের ছোট্ট দোকান দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু সেখানে কোনো নাম লেখা নেই।

দোকানের সামনে রাস্তার ওপর খানকয়েক বেঞ্চি পাতা। সেখানে কয়েকজন লোক বসে আছেন। তাঁদের সকলের হাতেই ছেনোদার মতো একটা চামড়ার ব্যাগ।

ছেনোদাকে দেখে বেঞ্চিতে বসা লোকেরা হৈ হৈ করে উঠলেন। রোগা-রোগা চেহারার মানুষগুলোর। অনেকেই হাফ্-প্যাণ্ট পরেছেন। দু-একজন পরেছেন আধময়লা ধুতি আর রং-ওঠা নিউকাট জুতো।

রেমিংটন রিবনের কৌটো থেকে বিড়ি বার করে দেশলাই জ্বালাতে জ্বালাতে একজন বললেন, "এই যে বাবা, আসুন।"

ছেনোদা কিন্তু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, তোমাদের আমি মাইরি সাবধান করে দিতে চাই। মুখ দিয়ে যদি আর খারাপ কথা বেরোয় তাহলে একটি ঘুঁষিতে মুখের জিওগ্রাফী পাল্টে দেবো।"

ছেনোদা এবার আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। "এ আমার ছোট ভাই-এর মতো। তোমাদের মতো বিশ্ববখাটে নয়। খুব ভাল ছেলে। এর লেখা পদ্য, গল্প কাগজে ছাপা হয়।"

ভদ্রলোকরা এবার সত্যিই বেশ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

যে ভদ্রলোক প্রথমে মুখ খুলেছিলেন তিনি বললেন, "কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনার দাদার সঙ্গে 'বাবা' সম্পর্ক পাতিয়েছি। অনেকদিনের বদ অভ্যাস। দু-একবার ভুল হয়ে যেতে পারে।"

দোকানের মধ্যে যে-ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর গায়ে একটা তেল-চিটে গেঞ্জি। চোখের চশমার একটা ডাঁটি নেই, সুতো দিয়ে বাঁধা। কাঁচের আলমারির মধ্যে নানা সাইজের যন্ত্রপাতি। ছেনোদা বললেন, "পাঁচুদা, কেন মাইরি ল্যাজে খেলাচ্ছো, একটা এসকেপমেণ্ট হুইল দাও। না-হলে পার্টিটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

পাঁচুদা পান চিবোতে-চিবোতে বললেন, "চোদ্দ নম্বর রেমিংটন তো? কোম্পানির মাল নাও, আনিয়ে দিচ্ছি।"

বেঞ্চির এক ভদ্রলোক এবার নিচু গলায় ফোড়ন কাটলেন, "আর সাধুগিরি করতে হবে না। কোম্পানির ঘরের মাল বেচেই তো উনি সোয়ালো লেনের বিজনেস চালাচ্ছেন। কোম্পানির ঘরে মাল কিনে মেশিন সারাতে হলে আমাদের আর করে খেতে হবে না।"

আন্দাজে বুঝলাম পুরানো মালের স্টক এখানে। পাঁচুবাবু মিটমিট করে হেসে বললেন, "যাক, একটা মাল যেখান থেকে হয় তোমাকে

দিয়ে দেবো। কিন্তু পুরো দশটি টাকা লাগবে।”

“এই জন্যেই তো তোমার সংসারে অশান্তি। ঘরের লোকের সঙ্গে পর্যন্ত কাবলিওয়ালার মতো ব্যবহার করবে? পাঁচসিকের মাল কিনা দশ টাকায় বেচতে চাইছো!”

ওঁদের কথা চলতে লাগলো। আমি বেঞ্চিতে এসে চুপচাপ বসে রইলাম।

এক ভদ্রলোক বললেন, “তুনিয়ার যত টাইপ মেকানিককে এখানে আসতে হয়। আমরা সবাই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি—রেমিংটন বা আণ্ডারউড-এ মাস মাইনের চাকরি নয়।”

পাঁচুবাবুর কাছ থেকে পার্টস্ কিনে ছেনোদা বেঞ্চিতে এসে বসলেন। এ-রাজত্বে ছেনোদার দোর্দণ্ড প্রতাপ। সব মেকানিক ওঁকে ভয় করেন। বেঞ্চিতে ততক্ষণ সতেরো-আঠারো জন মেকানিক জড়ো হয়েছেন। ছেনোদা বললেন, “দেখো, আমার এই ছোট ভাই-এর একটা চাকরি দরকার। টাইপ শিখেছে! তোমাদের আমি সাত দিনের সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যেখানে পারো একে ঢুকিয়ে দিতে হবে। না হলে কিন্তু ফাটাফাটি হয়ে যাবে বলে রাখছি।”

নোংরা জামাকাপড় পরা লোকগুলোর কেউ কিন্তু রাগ করলেন না। একজন বললেন, “আমাদের কাছে যে-ব্যাটারা মেশিন সারায় তারা কি মানুষ? এক-একটি ছারপোকা! চাকরি হলে রক্তও শুষে নেবে।”

ছেনোদা রেগে উঠলেন। বললেন, “রাজকেষ্ট, বাত পরে মারবি। এখন একটা খারাপ চাকরিই যোগাড় কর। আমার ভায়ের তো আর তোদের মতো হর্স পেজ পর্যন্ত বিদ্যে নয়। ওর পেটে সামথিং হ্যাজ।”

ছেনোদা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এক আপিসে মেশিন অয়েলিং ক্লিনিংয়ের কাজ ছিল। আমার হাতে ব্যাগটা দিয়ে ছেনোদা কাজ আরম্ভ করলেন। আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম।

কাজের মধ্যেই ছেনোদা আমার চাকরির চেষ্টা করলেন। কিন্তু যার পাথরচাপা কপাল, অন্য লোকে তার কী করবে? চাকরি নেই।

কাজ শেষ করে দুটো টাকা পকেটে পুরে ছেনোদা মেশিনের মালিককে বললেন, "মেশিনটা একবার ওভারহল করিয়ে নিন, আবার দশ বছর হেসে খেলে চলে যাবে।"

মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, "কণ্ডিশন কেমন আছে?"

"কণ্ডিশন! এ সব বনেদী জিনিস। পুরানো চাল ভাতে বাড়ে স্যার। আজকালকার মডেলগুলো দেখতেই ছিমছাম, ফিটফাট—কিন্তু কোনো কাজের নয়। ব্রেকডাউন লেগেই আছে।"

মালিক মিষ্টি কথায় ভিজলেন না। বললেন, "আরও মাসখানেক দেখি।"

তখন প্রায় একটা বাজে। আমাকে নিয়ে ছেনোদা সোজা খাবারের দোকানে ঢুকলেন। প্রায় বারো আনার মতো খাইয়ে দিলেন আমাকে। আমি আপত্তি করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ছেনোদার ঐ এক যুক্তি, "ভাল ছেলেদের খাওয়া দরকার। তবে তো মাথা খুলবে। তবে তো গল্প, পদ্য এইসব লিখতে পারবি।"

টাইপরাইটারের বিচিত্র জগতের সঙ্গে আমি ক্রমশঃ পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। আণ্ডারউডের ডগ কাস্টিং যে স্মিথ করোনাতে লাগবে না, কিন্তু স্মিথের টাইপবার কুশন যে অনায়াসেই ইম্পিরিয়াল মেশিনে ফিট করা যাবে, তা আমিও একদিন জেনে ফেললাম।

কিন্তু চাকরি আর হয় না।

সোয়ালো লেনের মেকানিক বন্ধুরা সবাই কাজ থেকে ফিরে আসেন। বলেন, "কিছুতেই সুবিধে হচ্ছে না।"

ছেনোদা সেই কথা শুনে বেজায় রেগে ওঠেন। বলেন, "পিঁয়াজি ছাড়ো। আরও তিনদিন সময় দিলুম। এর মধ্যে যদি কাজ না হয় তাহলে তোমাদের প্রত্যেকের রোজ এক আনা ফাইন দিতে হবে। ট্যাঁকের কড়ি খরচ হলে তবে যদি তোমাদের গতর নড়ে।"

এরপর ছেনোদা গালাগালি দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে চুপ করে গেলেন।

আমি ছেনোদাকে বলেছি, "কতদিন আর আমার জন্য পয়সা নষ্ট করবেন ?"

"আমি তো নষ্ট করছি না। তুই রোজগার করছিস। এই যে আমার সঙ্গে আপিসে-আপিসে যাচ্ছিস, আমাকে সাহায্য করছিস, এর কোনো দাম নেই ?"

সাহায্য তো খুব করছি! পার্টির কাছে ছেনোদা আমাকে অ্যাসিসট্যান্ট বলে পরিচয় করিয়ে দেন। মেশিনে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে-করতে বলেন, "টেক ডাউন"! আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে রবার-স্ট্যাম্পমারা প্যাড বার করে এস্টিমেট লিখি—'ওয়ান ক্যারেজ স্ট্র্যাপ—৮৲; ওয়ান ডগ কাস্টিং—৪০৲; সার্ভিস—৫৲। মোট ৫৩ টাকা।'

খদ্দের সেই হিসেব দেখে চমকে ওঠেন। "এতো টাকা!"

আমি বলি, "না স্যার, এই আমাদের ইউজুয়াল চার্জ। কিন্তু আপনি রেগুলার কাস্টমার, আপনার সম্মানে দশ টাকা ছাড়।"

ছেনোদা কাগজখানার উপর বিরাট লম্বা সই বসিয়ে দেন—

এল মণ্ডল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তারপর বলেন, "আমরা স্যার, ব্যাগ হাতে করে ঘুরে বেড়াই তাই। কোম্পানির ঘরে মেশিনটা একবার পাঠিয়ে দেখবেন। রিপেয়ার তো দূরের কথা, শুধু ইনেসপেকশন চার্জই নেবে পঞ্চাশ টাকা।"

"কোম্পানির কাজ আর আপনাদের কাজ?" খদ্দের মন্তব্য করলেন।

ছেনোদা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কোম্পানির মিস্ত্রিদের হাত দুটো কি আর সোনা দিয়ে বাঁধানো আছে স্যার? আমারই মতো কোনো হতভাগা মেশিন সারবে; কিন্তু কাগজে সই করবে কোট-প্যান্ট-টাই পরা রাঙা সায়েব। তাদের মাইনেটা কোত্থেকে আসবে স্যার—এই আপনাদের ঘাড় দিয়েই তো?"

খদ্দের একটু ভিজছে দেখে ছেনোদা আরও বলেন, "কোম্পানির কাজও তো দেখছি স্যার। মেশিন সেরে যেদিন ফিরলো, সেদিনই খারাপ হয়ে গেল। বিশ্বাস না হয়, ঠিকানা দিয়ে দিতে পারি। এখন কোম্পানি ছেড়ে আমাকে কাজ দিচ্ছে। যা-তা পার্টি নয় স্যার—মেমসায়েব টাইপিস্ট।"

খদ্দের বললেন, "তাই বুঝি?"

ছেনোদা বললেন, "মেমসায়েব আমার কাজে খুব খুশী। তিনি বলেন, মিস্টার মাণ্ডল্ তোমার টাচ্‌টা—আহা যেন ফেদার টাচ্। ওরা কী-বোর্ডে টাচের মূল্য বোঝে। সরু-সরু আঙুল তো, হাতুড়ি পেটার মতো টাইপ করতে পারে না।"

খদ্দের বললেন, "বটে?"

ছেনোদা নিবেদন করলেন, "লোক ভাল করে মেশিন সারায় কেন? ওই জন্যেই তো, শুধু চিঠি ভাল হবে তা নয়—প্রোডাকশন বেড়ে যাবে। একজন লোক দুটো টাইপিস্টের কাজ করবে।"

ছেনোদা এবার নিজের প্রসঙ্গ তুললেন। "তা হলে এস্টিমেটটা একটু দেখবেন নাকি ?"

"না, রেখে যান, পরে জানাবো।"

এই রকম কত এস্টিমেটই তো তৈরি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্ডার আসে খুব কম। দোকানের পাঁচুবাবু বলেন, "এই কারবারের এই হাল। মেকানিকরা তবু অয়েলিং ক্লিনিং করে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। আমি তো শুধু প্লার্টস্ নিয়ে চুপচাপ বসে আছি, আর মাছি তাড়াচ্ছি।"

সত্যি এ এক অদ্ভুত জগৎ। হাসি-ঠাট্টা, গালাগালির মধ্যে দিন কাটছে বটে, কিন্তু বিকেল বেলায় বাজার করবার টাকা রোজগার হবে কিনা তাও কেউ জানে না। কারও আবার হয়তো কোনোদিন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মেশিনের দালালী করে কুড়ি টাকা জুটে গেল। অন্য সঙ্গীরা সে খবর পেলে হয়! সবাই একসঙ্গে ছেঁকে ধরবে। বলবে, "হ্যাঁরে ঋষে, ওই বুড়ী মেশিন দুশো টাকায় বিক্রি করলি কী করে ?"

ঋষিবাবু মাথা নাড়লেন। "সাজাতে জানলে সব পুরানো মেশিনকে নতুন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়! বাইরেটা কোনোরকমে চকচকে করে দাও। তাতেই বোকা খদ্দের খুশী—ভিতর নিয়ে তারা একটুও মাথা ঘামায় না।"

একজন ফোড়ন কাটলো, "বুড়ী যখন বেঁকে বসবে, তখন বুঝবে।"

ঋষিবাবু উত্তর দিলেন, "তাতে তোরই কী, আমারই কী? ডাক পড়লে সেরে দেবো, আবার বিল করবো।"

এঁরা সবাই সংসারী লোক। চিন্তার শেষ নেই। একজন বললেন, "কী দিন-কালই যে পড়লো।"

ছেনোদার সংসার নেই। কিন্তু অভাব আছে। তবু মুখ ফুটে সেকথা বলেন না। আমি আবার তাঁর ঘাড়ে চেপেছি। কিন্তু আমার

যে উপায় নেই। পৃথিবীতে এতো মানুষ থাকতে ছেনোদা আমাকে ভালবাসেন কেন বুঝতে পারি না। সে আমার স্বভাবের জন্য নয়, সে আমার দারিদ্র্যের জন্যও নয়। সে আমার লেখার জন্য। কবে হঠাৎ একটা লেখা ইস্কুলের ম্যাগাজিনে লিখেছিলাম। ছেনোদা সেটা পড়েনও নি, শুধু হয়তো দেখেছিলেন। তাতেই উজাড় করে ভালবাসা ঢেলে দিলেন। আর তারই সুযোগে দিনের পর দিন এই সোয়ালো লেনের দোকানে তাঁর ঘাড়ে বসে খাওয়া-দাওয়া করছি।

আমাকে পাঁচুবাবুর দোকানে বসিয়ে রেখে ছেনোদা একদিন বেরিয়ে গেলেন। তিনি বেরিয়ে যেতে পাঁচুবাবু ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে হাসতে লাগলেন।

একজন জিজ্ঞেস করলো, "ছেনোবাবু গেলেন কোথায়?"

পাঁচুবাবু বললেন, "বুঝতেই পারছো। আজ মাসের সাত তারিখ।

ঋষিবাবু বললেন, "ভাগ্য! না-হলে ছেনোবাবু এমন পার্টি পাবে কেন?"

পাঁচুবাবু বললেন, "তোমাদের পোড়া কপাল—তোমরা চিরকাল দিশী কোম্পানির টাইপিস্ট বাবুদের মেশিন পরিষ্কার করেই মরবে।"

"যা বলেছেন দাদা। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি আর ময়লা শার্ট পরে টাইপিস্ট বাবু বসে আছেন। অথচ ছেনোর ভাগ্যে কেমন একটা বিলিতী কোম্পানি রয়েছে।" আর একজন বললো।

এরপর ছেনোদাকে নিয়ে ওঁদের মহলে নানা আলোচনা হলো।

ওঁদের নজরটা এবার আমার উপর গিয়ে পড়লো। একটু ভয়ও পেলেন। পাঁচুবাবু ঢোক গিলে বললেন, "আমরা মশাই নিজেদের মধ্যে একটু খিস্তি-খেউড় করি—আপনার দাদাকে যেন বলবেন না। উনি যা লোক, হয়তো খুন জখম করে বসবেন।"

আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, "বেশ।"

হয়তো আরও কথা হতো, কিন্তু একজন সাবধান করে দিলো ছেনোদা আসছেন। ওঁরা সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে ফিউজ হয়ে গেলেন। আমাকে ইশারায় পাঁচুবাবু নীরব থাকবার প্রতিশ্রুতিটা মনে করিয়ে দিলেন।

ছেনোদা এসে বেঞ্চিতে বসলেন। অন্য মেকানিকরাও ক্রমশঃ সেখানে জড়ো হলেন। ছেনোদা বললেন, "তা হলে তোমরা আমার ভাই-এর চাকরির জন্যে কিছুই করোনি। বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গিয়েছে, আজ তা হলে ফাইন দাও। ন্যাপা, প্রত্যেকের কাছ থেকে এক আনা করে আদায় করো।"

যেমন হুকুম তেমন কাজ। ন্যাপা ফাইন আদায় করতে আরম্ভ করলো। দেখলাম বিনা প্রতিবাদে ন্যাপার হাতে এক আনা করে সবাই দিতে লাগলো। ছেনোদা চার আনা দিলেন। "তা হলে টোটাল কত হলো ?"

ন্যাপা বললে, "একটাকা চার আনা।"

"গুড," ছেনোদা বললেন।

বাড়ি ফেরার পথে হাওড়া স্টেশনে ছেনোদা পয়সাটা আমার হাতে দিলেন। আমার খুবই লজ্জা করছিল। কিন্তু ছেনোদা প্রচণ্ড এক বকুনি দিলেন।

টাইপপাড়ায় প্রায় রোজ যাতায়াত আরম্ভ করেছি। পাঁচুবাবুর কাছে আমাকে বসিয়ে রেখে ছেনোদা আবার বেরিয়ে গিয়েছেন।

সেদিন বিকেলের দিকে বেশি লোকজন ছিল না। পাঁচুবাবু শুধু একটা টাইপবুরুশের পিছন দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিলেন। পার্টির

কাছ থেকে ঘুরে ঋষিবাবু এবার দোকানে এসে বসলেন।

ঋষিবাবু কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে বললেন, "পাঁচুদা, কিছু ক্যাশ চাই। বউ-এর অসুখ। দু'দিন তো হোমিওপ্যাথিক বড়ি দিলুম—কিন্তু কিছু সুফল দেখছি না। আজ ডাক্তার ডাকতেই হবে। কিছু টাকা দাও পাঁচু দা।"

পাঁচুদার চোখদুটো এবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলেন, "সকালে কী মন্তর দিয়েছিলুম? ছিপে উঠলো কিছু?"

ঋষিবাবু তাঁর কাছে সরে গিয়ে ফিস-ফিস করে জানালেন, "না উঠিয়ে উপায় ছিল না। তবে ন্যায্য দাম দিও।"

পাঁচুবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দুজনে কী সব কথাবার্তা হলো। তারপর ঋষিবাবু শার্টের পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা জিনিস বার করে পাঁচুবাবুর হাতে দিলেন। পাঁচুবাবু একখানা পাঁচটাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বললেন, "পাকা জহুরী!"

পাঁচুবাবু এবার আমার দিকে নজর দিলেন। বললেন, "ছেনোটা তো ডাকসাইটে গুণ্ডা, কিছু বলতে সাহস হয় না। রোজ এক আনা করে ফাইন আদায় করছে। সেই ফাইনের টাকা—রোজ পাঁচসিকে তোমাকে দেবে, যতদিন না চাকরি হয়।" পাঁচুবাবু একটু থামলেন। তারপর তীব্র ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "তুমি কী ধরনের মানুষ?"

আমি চমকে উঠেছি। পাঁচুবাবু তেড়ে উঠলেন। "লজ্জা করে না, পরের কাছে ভিক্ষা নিতে? কেন? এই যে এতো জায়গায় টাইপের এস্টিমেট দিতে যাও—কাজ বাগিয়ে আসতে পারো না? ব্যাটাছেলে! দুটো ফিড রোলারের দাম কত জানো?"

একটু পরে ছেনোদা ফিরে এলেন। সবার কাছ থেকে এক আনা ফাইন আদায় করলেন। তারপর ফেরার পথে আড়ালে ডেকে নিয়ে

গিয়ে ফাইনের পয়সাগুলো আমাকে দিলেন। আমার তখন ঘেন্নায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে।

ছেনোদা বললেন, "ছিঃ, তুই না গল্প লিখিস? এখন বাড়ি যা। কাল সকাল-সকাল রেডি হয়ে থাকবি। চন্দননগরে একটা মেশিন দেখতে যাবো।"

পরের দিন হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠে বসেছি আমরা। ছেনোদা সর্ব সময়ই আমার কাছে ছোট হয়ে থাকতেন। আমি যে ভাল ছেলে। আমার মুখ দিয়ে ভুলেও যে একটা খারাপ কথা বেরোয় না। আমি তো আর পরীক্ষার হল্-এ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়িনি। কোনোদিন ভুলেও আমি কারুর খাতার দিকে তাকাইনি পর্যন্ত। চুরি করিনি, অন্য কাউকেও চুরি করতে সাহায্য করিনি।

ছেনোদা বললেন, "দোকানে ওইসব অসভ্য লোকগুলোর সঙ্গে বসে থাকতে তোর কষ্ট হয়, তাই না?"

"না"—আমি উত্তর দিলাম।

চন্দননগরে আমরা একটা বিরাট বাড়ির সামনে হাজির হলাম। বাড়ির মালিক নামকরা ব্যবসাদার। তাঁরই ঘরের টাইপরাইটার।

শেঠজী তখন গেঞ্জী পরে হনুমানজীর ছবির সামনে মাথা ঠুকছিলেন। শেঠগিন্নী আমাদের বসতে দিলেন। চাকর টাইপরাইটার মেশিনটা আমাদের সামনে টেবিলে বসিয়ে দিয়ে গেল।

শেঠজী এসে জানালেন, এই মেশিনটা খুব পয়া। ভাঙা লোহার সামান্য দোকান থেকে আজ যে তিনি বাড়ি, গাড়ি, মিল করেছেন তার যত চিঠিপত্তর সব ঐ মেশিন থেকেই বেরিয়েছে।

ছেনোদাও অভিজ্ঞ শিকারীর মতো মেশিনটা একটু নেড়েচেড়ে

বললেন "একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। একটু রিপেয়ার করে নিলে নতুনের মতো কাজ দেবে। লছমী মাইয়া এবং ভগবতী মাইয়ার মতো মেশিনও সেবা পেলে সন্তুষ্ট হয়।"

ব্যাগ খুলে যন্ত্রপাতি বার করলাম। বিশেষ যত্নের সঙ্গে ছেনোদা ক্যারেজটা আস্তে-আস্তে খুলে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। অভিজ্ঞ চোখে তিনি এবার ঐ ধুলোপড়া বৃদ্ধা মেশিনের অসুখ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। আমিও দেখছি এক মনে।

ছেনোদা মেশিনের দিকে চোখ রেখেই বললেন, "টেক ডাউন।" প্যাড বার করে, একটা কার্বন লাগিয়ে আমি টুকতে লাগলাম— "ওয়ান ক্যারেজ স্ট্র্যাপ···ওয়ান এসকেপমেণ্ট হুইল···।"

শেঠজী বললেন, "পুরানো মেশিনকে একেবারে নতুন বানিয়ে দিতে হবে।"

কালিঝুলিমাখা হাত দু'খানা ময়লা ঝাড়নে মুছতে-মুছতে ছেনোদা হিসেব করতে লাগলেন। আর আমি মেশিনের মধ্যে একটা কাগজ ছাপিয়ে টাইপের নমুনা নিতে লাগলাম। ছেনোদা বললেন, "শেঠজী, তিরিশ টাকা লাগবে।"

"ত্রিশ রূপেয়া!" শেঠজী জীবনে এমন আশ্চর্য কথা শোনেননি। মোটর গাড়ি মেরামতেও নাকি এতো টাকা লাগে না! শেঠজীর সোনা-বাঁধানো দাঁতটা চক-চক করে উঠলো। শেঠজীর ধারণা, দু-তিন টাকা খরচ করলে রেমিংটন কোম্পানি নিজেই ঐ মেশিন সেরে দেবে।

রাগে অপমানে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলছে। ছেনোদার মুখও লাল হয়ে উঠেছে। আমাদের দুজনের গাড়িভাড়াই তো তিন টাকা।

ছেনোদা বললেন, "অতদূর থেকে এলাম, তা হলে অয়েল করে দিয়ে যাই। দু টাকা দেবেন।"

"সামান্য এক কৌটা তেলের জন্য দু টাকা।" শেঠজী লাফিয়ে উঠলেন। 'বেওসা' করতে নেমে আমরা নাকি একদম ডাকু বনে গিয়েছি।

ছেনোদা তখনও শেঠজীকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, এর থেকে কম টাকায় কেউ অয়েল করে না—কিন্তু ওই ঝুনো নারকোল ভাঙা অত সহজ নয়।

আমি তখন বেজায় চটে উঠেছি। দাঁড়াও, অনর্থক এইভাবে আমাদের খাটিয়ে নেওয়ার ওষুধ দিচ্ছি। ওঁরা দুজনে কথা বলছেন, আমি ততক্ষণ মনস্থির করে টাইপরাইটারের উপর ঝুঁকে পড়েছি। আমার হাতদুটো কাঁপছিল, তবুও···। মিনিট দুয়েক মাত্র লেগেছিল। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ছেনোদাকে বললাম, "এমন কাজ দরকার নেই আমাদের, চলুন ফিরে যাই।"

ছেনোদার মতো গোঁয়ার, রগচটা লোক যে আমার কথাতেই শেঠজীকে ছেড়ে চলে আসবেন ভাবতেও পারিনি। অন্য সময় হলে হয়তো ফাটাফাটি হয়ে যেতো। কিন্তু মেশিনটাকে সরিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম। আমার পা দুটো তখন বেশ কাঁপছে। হাত-দুটোও যেন অবাধ্য হয়ে উঠছে। এ যেন অন্য কারও হাত, আমার নয়। কোনো অদৃশ্য ইনজেকশনে হাতদুটো নাড়াবার শক্তিও যেন নষ্ট হয়েছে।

রাস্তায় নেমেই ছেনোদা আমার হাতদুটো চেপে ধরলেন। তারপর আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন···না, সে চাহনির বর্ণনা দেবার মতো শক্তি আমার নেই। সে চোখে কী ছিল? সে আমি নিজেই জানি না। কিন্তু আমি বুঝলাম আমি তাঁকে ফাঁকি দিতে পারিনি। আমি ধরা পড়ে গিয়েছি। বজ্রাহত হলেও ছেনোদা এতো

আশ্চর্য হতেন না। শুধু কোনোরকমে বললেন, "এ কি করলি তুই!"

শুধু হাত-পা নয়, আমার সমস্ত দেহই ততক্ষণে অবশ হয়ে এসেছে। মনে হলো এখনই হয়তো পথের মধ্যে লুটিয়ে পড়বো। বললাম, "দুটোমাত্র ফিড রোলার খুলে নিয়েছি।"

ছেনোদার তখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। বললেন, "তুই না পদ্য লিখিস!"

হা ঈশ্বর, একি করলে! রাগের মাথায় শেঠজীকে শাস্তি দেবার জন্যে কেন আমার এই দুর্মতি হলো! ধরণী তুমি দ্বিধা হও। এই মুহূর্তেই আমার হৃৎপিণ্ডটা বন্ধ হচ্ছে না কেন? সব সঙ্কোচ থেকে মুক্তি পেতাম। ভয় হলো, ছেনোদা ঐ লোহার মতো কঠিন হাত দিয়ে হয়তো আমাকে এক থাপ্পড় মারবেন। কিন্তু কই? কিছুই তো করলেন না। তাঁর মুখটাও একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। বোধহয় নিজের অনাগত ভবিষ্যতের ছবি তাঁর চোখের আয়নায় মুহূর্তের জন্য প্রতিফলিত হয়েছিল।

কানে-কানে ছেনোদা বললেন, "ওরা বুঝতে পেরেছে।" তারপর আমাকে প্রায় হিড়-হিড় করে টানতে-টানতে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

কিন্তু সত্যিই ওরা বুঝতে পেরেছে। হৈ-হৈ করে দুটো দারোয়ান আমাদের দিকে ছুটে আসছে। সেই মুহূর্তে আমার চেতনা যেন হঠাৎ ফিউজ হয়ে গিয়েছিল। কিছু স্মরণ করতে পারছি না। শুধু মনে আছে, ছেনোদা চোরাই ফিড রোলার দুটো আমার হাত থেকে আচমকা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। বোধহয় আমি বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু ছেনোদা বলেছিলেন, "আমরা দাগী লোক, আমাদের কিছুই হবে না।" ফিড রোলার দুটো নিজের পকেটে পুরতে-পুরতে বলেছিলেন,

"তোর যে না-হলে রেকর্ড খারাপ হয়ে যাবে।"

তারপর কি হয়েছিল আমি কিছুতেই মনে করতে পারি না। দারোয়ানরা আমাদের দুজনের ঘাড় চেপে ধরেছিল। আমার পিঠেও কিল পড়েছিল দু-একটা। ছেনোদার নাক দিয়ে তখন ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। তবু ছেনোদা বলেছিলেন, 'ওকে ছেড়ে দিন, ওর কোনো দোষ নেই। আমি চুরি করেছি।"

ওরা সত্যিই আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। আর ছেনোদাকে থানায় পাঠিয়েছিল।

একটা আধলাও ছিল না আমার কাছে। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে বাড়ি ফিরে এসে সারা রাত কেঁদেছি। কাঁদতে-কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছি, পুলিস আমার কোমরে দড়ি বেঁধেছে! আমাকে রুল দিয়ে গুঁতো মারছে। হাজারখানেক লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিৎকার করছে—চোর, চোর! আর ছেনোদা বলছেন, "ওকে ছেড়ে দিন। ওর কোনো দোষ নেই, আমি চুরি করেছি।"

চমকে জেগে উঠেছি। ঘামে সমস্ত দেহ ভিজে উঠেছে। একি করলাম আমি! একি করলাম!

ভোরের আলো পৃথিবীর মানুষদের জন্যে যে এতো সঙ্কোচ আর লজ্জা নিয়ে আসে তা জানতাম না। মনে হলো আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সবাই দেখছে আমাকে। আবার চমকে উঠেছি। এবারও স্বপ্ন দেখছিলাম।

কেউ জানতে পারেনি। আমার জীবনের সেই অন্ধকার মুহূর্তের সংবাদ কারুর কাছে প্রকাশিত হয়নি। কাগজে খবর বেরিয়েছে—"টাইপরাইটারের অংশ চুরির দায়ে তিনমাস কারাদণ্ড।" ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে যে তীব্র মন্তব্য করেছেন,

তারও বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

অন্য কেউ হলে হয়তো পাগল হয়ে যেতো। হয়তো সে আত্মহত্যা করতো। কিন্তু আমার মতো কাপুরুষ গর্দভের পক্ষে কোনো কিছু করাই সম্ভব নয়। শুধু মাঝে-মাঝে চন্দননগরের দৃশ্যটা মনের একান্তে ভেসে উঠলেই অবশ হয়ে পড়তাম।

কতদিন গভীর রাত্রে লুকিয়ে-লুকিয়ে কেঁদেছি আর ভেবেছি, এ-লজ্জা আমি কেমন করে ঢাকবো? কেমন করে আমি পৃথিবীর মানুষদের কাছে আবার মুখ দেখাবো? কিন্তু দেখলাম লজ্জা আমার সত্যিই ঢাকা পড়েছে। কেউ আমাকে চিনতে পারেনি।

তিন মাস পরে ছেনোদা জেল থেকে ফিরে এসেছেন। খবর পেয়েছি, কিন্তু দেখা করতে সাহস হয়নি। কোঁড়ারবাগান দিয়ে পথ হাঁটাই বন্ধ করে দিয়েছি। ছেনোদার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস নেই আমার।

কিন্তু আমার জন্যে ছেনোদার যে এমন হবে কে জানতো? ছেনোদার সব গিয়েছে। সোয়ালো লেনের পাঁচুবাবু ছেনো মণ্ডলকে আর বেঞ্চিতে বসতে দেননি। জেল-খাটা টাইপরাইটার চোরকে দিয়ে কে আর মেশিন সারাবে?

তারপর? তারপর শুরু হয়েছে নিশ্চিত অধঃপতনের ইতিহাস। আমার অপরাধ নিজের দেহে ধারণ করে নিজের সর্বনাশকে ডেকে এনেছেন ছেনোদা। আমার বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে উঠেছে। কিন্তু দেখা করবার সাহস হয়নি।

তারপর চোর হয়েছেন ছেনোদা। শেষে ডাকাত।

আর আমার কথা? সে তো ক্রমশঃ সবই তোমাদের কাছে নিবেদন করবো। আমার জীবন-অঙ্কের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কারুরই জানতে বাকি থাকবে না।

মধ্যিখানেও অনেক কথা। সেসব বলবো বলেই আজ লিখতে বসেছি। অনেক অগ্নি-পরীক্ষার পর সংসারের দেবতা একদিন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে আমার উপর কৃপাবর্ষণ করলেন। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে আমি উপরে উঠতে শুরু করেছি। দরদী সাহিত্যিক হিসেবে আমি পাঠক মহলে হঠাৎ পরিচিত হয়েছি। আমার রেকর্ড যে শরতের আকাশের মতোই নির্মল। পৃথিবীর কোথাও, এমন কি চন্দননগরের পুলিস খাতাতেও আমার সম্বন্ধে কিছু লেখা নেই!

ঘটনাটা ঘটেছিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে একটি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়ার সংবাদ ঘোষণা করবার পরই। একটি প্রখ্যাত মাসিক-পত্রের বিশেষ প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসছেন সেদিন। তিনি জানিয়েছিলেন আমার কয়েকটা ছবিও তুলবেন।

হাতে তখনও একটু সময় ছিল। তাই পাড়ার হেয়ার কাটিং সেলুনে গিয়ে হাজির হলাম। সেলুনের মালিক উমাপতিবাবু খাতির করে তাড়াতাড়ি চেয়ার এগিয়ে দিলেন। বললেন, "আপনি যে এই বদ পাড়ায় এখনও ভাড়াটে রয়েছেন এইটাই আমাদের সৌভাগ্য। এখানে থেকেও কত উচ্চ চিন্তা করছেন দিনরাত। লেখাপড়ার মধ্যেই তো সারাজীবন ডুবে রইলেন, আর কিছুরই তো খেয়াল করলেন না।"

এমন সময় বাইরে থেকে একটা বিকট চিৎকার কানে এলো—বলো হরি, হরিবোল। দেড়টাকা দামের বাঁশের খাটিয়ায় মাদুর দিয়ে মোড়া একটা মৃতদেহ চলেছে। বাহকরা আর একবার উল্লাসে চিৎকার

করে উঠলো—বলো হরি, হরিবোল।

সাবান-মাখানো বুরুশটা আমার গালে মাখাতে-মাখাতে উমাপতিবাবু বললেন,—"গুণ্ডাটা তা হলে খতম হলো! অনেকদিন থেকেই ভুগছিল। কতই বা বয়েস হয়েছিল। কিন্তু ঐ যে বলে স্যার, যেমন কর্ম তেমন ফল। সৎপথে থাকলে এখনো কতদিন বেঁচে থাকতিস। আর মরলেও পাঁচটা লোক নাম করতো; দশটা লোক খাটের পিছন-পিছন যেতো। ফুল পড়তো, মালা আসতো। কিন্তু ঐ ছেনো মণ্ডলের মতো হলে মাদুর মোড়া হয়ে পকেটমার জোচ্চোরদের ঘাড়ে বেশ বাঁশতলাঘাটে যেতে হবে।"

আমার মাথাটা তখন ঘুরতে আরম্ভ করেছে। উমাপতিবাবু বোধহয় আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, "সামান্য ছেনোর খবরেই আপনার মুখ নীল হয়ে উঠলো?"

হা-হা করে হেসে উমাপতি বললেন, "এই জন্যেই বলে শিল্পীর মন। সব মানুষকেই আপনারা না ভালবেসে পারেন না। রবিঠাকুরও তো ঐ রকম ছিলেন শুনেছি—গরীবের দুঃখু একদম সহ্য করতে পারতেন না। ছেনোটা মরতে কিন্তু পাড়ার ইজ্জত রক্ষে হলো, স্যার। না-হলে তো এ-পাড়ার নামই হয়ে গিয়েছিল গুণ্ডাপাড়া। আপনার মতো লেখক যে এখানে থাকেন, তা কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না।"

একটু থেমে উমাপতি বললেন, "তা স্যার গুণ্ডা বটে! একটা ফুসফুস তো ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল, তখনও চুরি করে বেড়াতো। পুলিসের কাছে কত মার খেয়েছে, তবু শিক্ষা হয়নি। এই তো রবিঠাকুরের জন্মদিন (তারিখটা আমার কিছুতেই মনে থাকে না, কতই বৈশাখ যেন) মহাকালী বিদ্যালয়ের একটা মেয়ের গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। বুঝুন একবার—কত বড় অমানুষ। রবিঠাকুরের

গান গাইবার জন্য একটা মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, তাকেও নিস্তার দিলে না। এই কোঁড়ারবাগানের বদনামের কথা ভাবতে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়।"

নিপুণ হাতে ক্ষুর চালাতে-চালাতে উমাপতিবাবু বললেন, "সব দোষই ছিল। শুধু কি আর চুরি ডাকাতি। কিন্তু আপনার মতো লোকের সামনে সে-সব আমি মুখে আনতে পারবো না।"

আমার শরীরটা তখন কেমন অবশ হয়ে পড়ছিল। কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু প্রশ্নের অপেক্ষা না-করেই উমাপতিবাবু বললেন, "শেষবারে তো চুরি করে জুয়ার আখড়ায় লুকিয়ে ছিল। কিন্তু পুলিসকে ফাঁকি দেওয়া কি আর অত সহজ? ওরা গিয়ে বাড়ি ঘিরে ফেলে ছেনোকে বার করলো। আর বলবো কী, আমার দোকানেও প্রায়ই এসে হামলা করতো। দাড়ি কামাচ্ছে, চুল ছাঁটছে। আবার হুকুম করছে-মাথা টিপে দাও, স্নো লাগাও, চুলে লাইমজুস দাও। একটা ঘণ্টা খাটিয়ে চলে যাচ্ছে। অথচ একটি আধলা পর্যন্ত ঠেকাচ্ছে না। নেহাৎ গুণ্ডাপাড়ায় দোকান করেছি তাই, অন্য জায়গা হলে দেখিয়ে দিতাম।

আমার মুখে আর একবার সাবান লাগাতে-লাগাতে উমাপতিবাবু বললেন, "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে স্যার! রোগে আর পুলিসে একসঙ্গে ধরলো।"

কথা বললেও তাঁর হাত চালানো বন্ধ ছিল না। আমার মুখে ডেটল লাগাতে-লাগাতে বললেন, "আপনি তো বিবেকানন্দ ইস্কুল থেকে পাস করেছেন—তাই না?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

"একেই বলে প্রকৃতির খেয়াল। ছেনো তো ঐ ইস্কুলেই

পড়েছিল। একই গাছে আম আর আমড়া ফললো।”

আরও বললেন, “মশাই, পাড়ার বদনাম। প্রতি রাত্রে সেপাই এসে ছেনোর খবর নিয়ে যেতো। হুকুম ছিল রাত্রে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না। আবার প্রতি সপ্তাহে একবার থানায় হাজিরা দিয়ে আসতে হতো।

“তা মশাই, রাত্রে সেপাই যেমনি চলে গেলো, অমনি বেরিয়ে চুরি করেছে।”

উমাপতিবাবু জানালেন, “তারপর টি-বি ধরলো। কিন্তু তখনও ছেনোর কী রস!

“গ্যাসপোস্টে ঠং-ঠং করে লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে সেপাই আসতো, চিৎকার করে বলতো, ‘ছেনুয়া, তুম ঘর মে হ্যায়?’

“ছেনো ভিরমী মেরে চুপচাপ শুয়ে থাকতো। তখন সেপাইজী রেগে গিয়ে বলতো, ‘ছেনুয়া, তুম কেয়া কর রহা হ্যায়?’

“ছেনো তখন বলতো, ইধারই তো হ্যায় সিপাইজী। আপকো মামাকা সাথ খানা বানাতা হ্যায়।”

উমাপতিবাবু বললেন, “বুঝুন আস্পর্ধাটা। পুলিসের সঙ্গে রসিকতা। পুলিসের মামাকে নিয়ে টানাটানি। শেষের দিকে অবশ্যি রস শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন সরা-সরা রক্ত উঠছে। কত নিরীহ লোকের সর্বনাশ করেছে!

“শেষের দিকে মশাই, সেপাই ডাকলেও ছেনো সাড়া দিতে পারতো না। আজকে ভোরে, সাড়া না পেয়ে সেপাই ভাবলো, ছেনুয়া বোধহয় আবার চুরি করতে বেরিয়েছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলে, বজ্জাতটা মরে পড়ে রয়েছে।”

উমাপতিবাবু এবার একটা ছোট আয়না আমার মুখের সামনে

ধরে বললেন, "ওসব ছোটলোকের কথা ছেড়ে দিন। আপনার নিজের মুখটা ভাল করে দেখে নিন।"

সেই বিখ্যাত মাসিক পত্রের বিশেষ-প্রতিনিধি সেদিন যথাসময়ে আমার কাছে এসেছিলেন। সাক্ষাৎকারের শেষে আমার কয়েকট. ছবিও তুলেছিলেন তাঁরা। উঠে পড়বার সময় আমার পড়ার ঘরে দেওয়ালে টাঙানো চারটে ছবির দিকে তাঁদের নজর পড়ে গেলো এঁরা হলেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, টলস্টয় ও ডিকেন্স।

বিশেষ-প্রতিনিধি বললেন, "একটা প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছি— সাহিত্যজীবনে কার কাছে আপনি ঋণী? কিন্তু উত্তর দিতে হ না—এই চারজনের ছবি দেখেই আমি জবাব পেয়ে গিয়েছি।"

আমি তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার গ দিয়ে একটুও স্বর বেরোয়নি। মাথাটা সেই মুহূর্তেই বোধহয় গিয়েছিল। যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন কাগজের প্রতিনিধি গিয়েছেন।